বৈষ্ণব প্রদীপ ১১

বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত
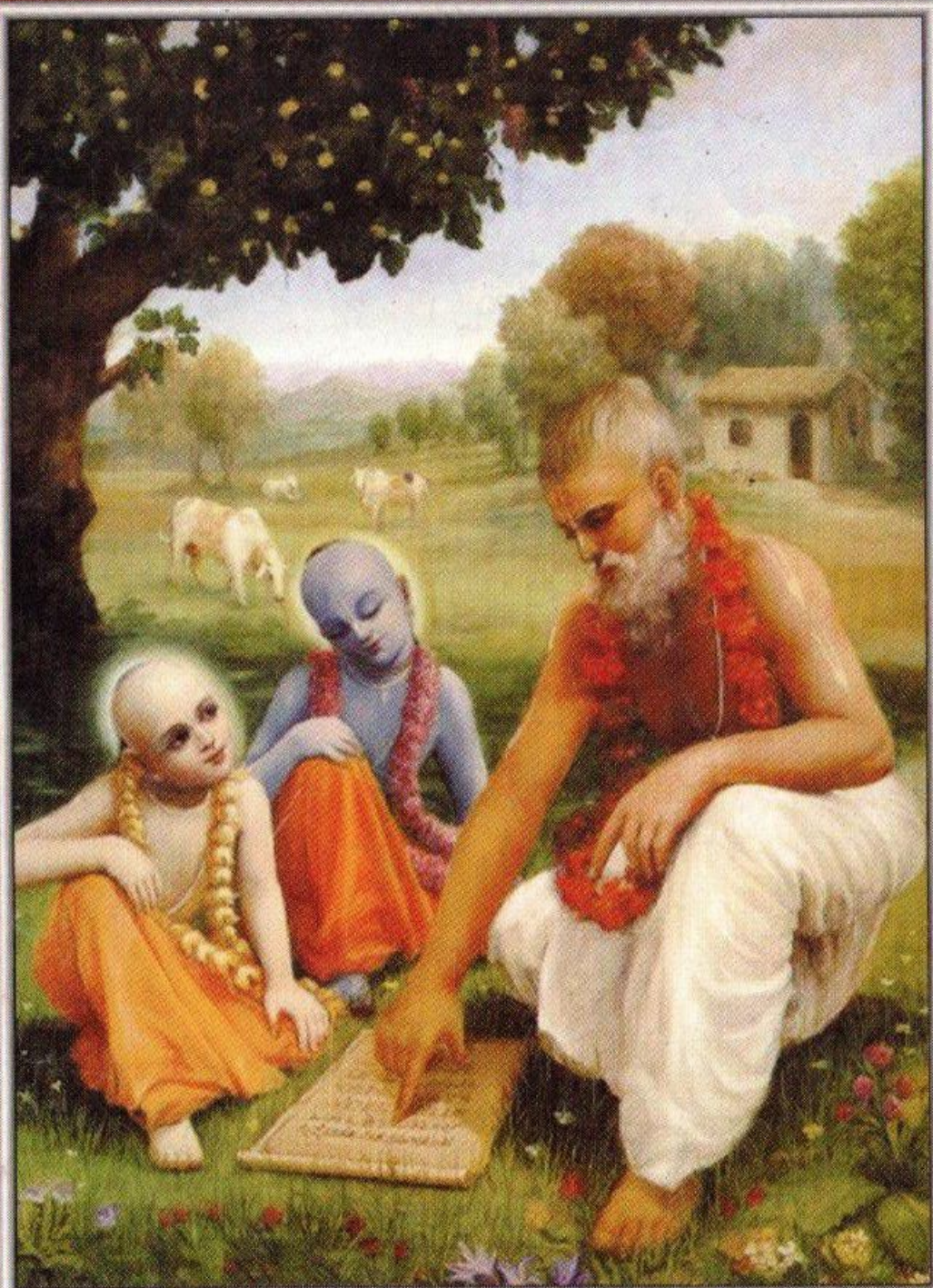
শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব প্রদীপ
(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

একাদশ খণ্ড

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

একাদশ খণ্ড

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রকাশক
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল
সূর্যোদয়
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবা. ০১৯১২ ৫২৬৫৫৪
০১৬৮১৬৫১৩৫৫

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

ভিক্ষা মূল্য : ৩০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট
পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজন
শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-এর করকমলে।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব
৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১ম খণ্ড
৮. বৈষ্ণব প্রদীপ : ২য় খণ্ড
৯. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৩য় খণ্ড
১০. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৪র্থ খণ্ড
১১. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৫ম খণ্ড
১২. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৬ষ্ঠ খণ্ড
১৩. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৭ম খণ্ড
১৪. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৮ম খণ্ড
১৫. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৯ম খণ্ড
১৬. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১০ম খণ্ড
১৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১১তম খণ্ড
১৮. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১২তম খণ্ড
১৯. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১৩তম খণ্ড
২০. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১৪তম খণ্ড

পরবর্তী বই

১. মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
২. মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা
৩. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
৪. মহাভারতের যুগে সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধকৌশল
৫. সর্বোত্তম অর্থনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ
৬. সর্বোত্তম রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ

লেখকের নিবেদন

প্রথমেই আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন্ ইতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল। এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্ন্তনিহিত আছে। কিন্তু এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ হয় নাই। যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। এজন্য এখনও পাঠ করে চলেছি। এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার ফসল এই বইটি। আপাততঃ ১০ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে প্রায় তিন হাজার প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির

আরও পরিবর্ধন হতে পারে। তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব ধর্মের আলোকে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু তথ্য তুলে ধরেছি। তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের শাস্ত্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান।

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভক্ত প্রবর শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (এ্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্জন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী নিমাই বসু, ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী নন্দগোপাল সাহা, ভক্তপ্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী কৌশিক দাসাধিকারী, ভক্তপ্রবর শ্রী সনাতন দাস, ভক্তপ্রবর শ্রী শ্যামল চন্দ্র শীল অন্যতম।

সবার শ্রীচরণে প্রণতি রইল।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
মনোরঞ্জন দে

প্রশ্ন : ১৯৪৪ ॥ তত্ত্বমসি শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর : তৎ (তাহাই—সেই ব্রহ্মই) ত্বম (তুমি, জীব) অসি (হও)। অর্থাৎ তুমি (জীব) সেই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ প্রমাণের জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য তত্ত্বমসি শব্দের এই রূপ অর্থ করেন। এই হল জ্ঞানমার্গের কথা। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতীকে এর অন্য অর্থ বলেন। তাহা এইঃ তত্ত্বমসি বলতে তস্য (তাহার—সেই ব্রহ্মের) ত্বম (তুমি—জীব) অসি (হও)। অর্থাৎ তুমি (জীব) ব্রহ্মেরই হও—ব্রহ্মের দাস হও। এই হল ভক্তিমার্গের অনুগত অর্থ।

প্রশ্ন : ১৯৪৫ ॥ শঙ্করাচার্য্য বলেন তত্ত্বমসিই মহাবাক্য। আর মহাপ্রভু বলেন প্রণবই—মহাবাক্য। কোনটি সঠিক?

উত্তর : সামবেদের অর্ন্তগত একটি অন্যতম উপনিষদ হল ছান্দোগ্য উপনিষদ। এই উপনিষদের একটি বাক্য হল তত্ত্বমসি। এর অর্থ হল তুমিই সেই ব্রহ্ম। সমগ্রবেদের বাচক হল প্রণব। আর বেদ হল প্রণবের বাচ্য। কাজেই প্রণব হল তত্ত্বমসিরও বাচক। প্রণব হল ব্যাপক, আর তত্ত্বমসি হল তার ব্যাপ্য। প্রণবে যা বুঝায় তারই এক ক্ষুদ্র অংশ হল তত্ত্বমসি। প্রণব ঈশ্বরাদি বস্তুকেও বুঝায়। তত্ত্বমসি তা বুঝায় না। প্রণবের বাচ্য হল তত্ত্বমসির বাচ্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কাজেই প্রণবের বদলে তত্ত্বমসি কখনো মহাবাক্য হতে পারে না।

প্রশ্ন : ১৯৪৬ ॥ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : ব্রহ্ম শব্দের প্রধান অর্থ করলে দেখা যায়— বৃহত্তম বস্তুই ব্রহ্ম। বৃহত্তম তত্ত্ব হওয়ায় এই ব্রহ্ম সর্ব ব্যাপক এবং সর্বসাক্ষী পরম স্বরূপ। ভগবৎবত্তায় বৃহত্তম হওয়ায় ব্রহ্ম শব্দে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। তিনি সবিশেষ, মূর্ত্তিমান।

প্রশ্ন : ১৯৪৭ ॥ নববিধা সাধন-ভক্তির কথা কি বেদেও আছে?

উত্তর : হ্যাঁ আছে। উদাহরণ দেয়া যাক।

১. **শ্রবণ সম্পর্কে :** পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যশ কথা কর্ণদ্বারা বার বার শ্রবণ করে তাঁকে পাওয়ার অভ্যাস করুক (ঋক্‌বেদ (১/৫৬/২)।
২. **কীর্তন সম্পর্কে :** আমি এখন শ্রীবিষ্ণুর লীলা কীর্তন করছি (ঋক্‌বেদ ১/১৫৪/১)।
৩. **স্মরণ সম্বন্ধে :** উরুগায় ভগবানে আমার স্মরণ বলবৎ হউক (ঋক্‌বেদ ১/১৫৪/৩)।
৪. **পাদ সেবন :** ভগবানের অক্ষয় ও মাধুর্য্য মণ্ডিত তিনচরণ (চরণের তিন বিন্যাস) ভক্তকে আনন্দিত করে (ঋক্‌বেদ ১/১৫৪/৪)।
৫. **অর্চ্চন সম্বন্ধে :** তোমরা সকলে মহান এবং শূরীবীর বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর (ঋক্‌বেদ ১/৫৫/১)।
৬. **বন্দন সম্পর্কে :** পরম সুন্দর ব্রহ্ম বিগ্রহকে আমি নমস্কার করি (যজুর্বেদ ৩১/২০)।
৭. **দাস্য সম্বন্ধে :** হে বিষ্ণো আমি তোমার সুমতির (কৃপার) ভজন করি (ঋক্‌বেদ ১/৫৬/৩)।
৮. **সখ্য সম্পর্কে :** তিনি উরুক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা (ঋক্‌বেদ ১/১৫৪/৫)।
৯. **আত্মনিবেদন :** যিনি অনাদি, জগৎ স্রষ্টা নিত্য নবায়মান ভগবানকে নিবেদন করে থাকেন (ঋক্‌বেদ ১/১৫৬/২)।

প্রশ্ন : ১৯৪৮ ॥ কোন লোক যদি শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণকেই সেবা করেন, অথচ নিতাই-গৌরকে অবজ্ঞা করেন তাহলে কি তার ভজন সার্থক হবে?

উত্তর : কোন ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ স্বরূপ বলে স্বীকার না করে অবজ্ঞা করলে স্বীয় উপাস্য ভগবৎ স্বরূপের কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যিনি যেকোন ভগবৎ স্বরূপের (যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রী নৃসিংহদেব, শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি) উপসনা যথাবিধি করবেন, তিনিই নিজের অভীষ্ট লাভ করতে পারবেন—যদি তিনি অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপের অবজ্ঞা না করেন। যেমন ভক্ত হনুমান শুধু শ্রীরাম চন্দ্রের সাধনা করতেন এবং একই সাথে কৃষ্ণকেও ভগবৎ স্বরূপ মনে করতেন। ফলে তিনি শ্রীরাম চন্দ্রের চরণ সেবা থেকে বঞ্চিত হন নাই। কাজেই নিতাই-গৌরকে অবজ্ঞা করে শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের ভজনা করলে তাঁদের কৃপা পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন : ১৯৪৯ ॥ ভগবান কৃষ্ণ তার কোন স্বরূপে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান?

উত্তর : দ্বিভূজ মূরলীধর স্বরূপে নয়। লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাসুদেব বিগ্রহেই অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান।

প্রশ্ন : ১৯৫০ ॥ জীবের জন্য ভগবানের অসংখ্য গুণের মধ্যে কোন্ গুণ সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করা যায়?

উত্তর : ভগবানের গুণ-অসংখ্য। ভগবানের যতসব গুণ জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করে তাদের মধ্যে ভগবৎ-করুণাকেই জীবের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা যায়। করুনাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগসূত্র। ভগবান রসিক এবং রস স্বরূপও হতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি করুনা করে তাঁকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা না দেন, তবে জীবের কি লাভ? কাজেই করুনাই জীবের জন্য ভগবানের সর্বোত্তম দান বলা যায়।

প্রশ্ন : ১৯৫১ ॥ আমরা গৌর-নিত্যানন্দের ভজন করবো কেন?

উত্তর : কোন্ ভগবৎ-স্বরূপের ভজন করা কর্তব্য, তা নির্ণয় করতে গেলে দেখতে হবে কোন্ ভগবৎ-স্বরূপে করুণার অভিব্যক্তি সবচেয়ে

বেশি। যে স্বরূপে কৃপার অভিব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সেই স্বরূপই ভজনীয়। শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা বিচার করলে দেখা যায় কৃপার এমন অভিব্যক্তি আর কোন স্বরূপে কোন যুগে দেখা যায় নাই। দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম তিনি যাকে-তাকে দান করেছেন। আর নিত্যানন্দ প্রভু এর বাস্তবায়ন করেছেন। এইজন্য গৌর-নিত্যানন্দের ভজন করা উচিত।

প্রশ্ন : ১৯৫২ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখি "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন, তবু নাহি পায় কৃষ্ণের প্রেমধন"—এর তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভঃ গ্রন্থে এবং ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর টীকায় এই সম্পর্কে বলেন : পার্ষদ দেহ চিন্তা করে সেই দেহে উপাস্য দেবের সাক্ষাতে থেকেই তাঁর প্রীতির জন্য শ্রী নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি ভজন-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে—এরূপ চিন্তার সাথে যে ভজন তাই সাসঙ্গ ভজন। এই সাসঙ্গত্ব যে ভজনে নাই, তাই অনাসঙ্গ ভজন। শেষোক্ত ভজনে হরিভক্তি পাওয়া যায় না, প্রেম পাওয়া যায় না। এই অনাসঙ্গ ভজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলা হয়েছে বহু বহু জন্ম বা কোটি কোটি জন্ম পর্যন্তও যদি অনাসঙ্গভাবে (সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিহীন হয়ে) শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি নববিধা ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয় তাহলেও শ্রীকৃষ্ণ পদে প্রেম (কৃষ্ণভক্তি) পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : ১৯৫৩ ॥ সাসঙ্গ ভজন এবং অনাসঙ্গ ভজন কি?

উত্তর : নিপুনতায় সাথে বিহিত হলেই ভজন বা সাধনকে সাসঙ্গ বলা হয়। শ্রীহরির সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিই সেই নিপুনতা। তাহলে বলা যায়, আমি শ্রীহরির সাক্ষাতেই উপস্থিত এবং এইভাবে তাঁর প্রীতির জন্য আমি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করছি—এই রূপ অনুভূতির সহিত যে ভজন তাকে বলে সাসঙ্গ ভজন। আর এরূপ ভাব বা অনুভূতি যে ভজনে নাই—অর্থাৎ যে ভজন অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন নিবিষ্ট থাকে না—যাতে সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তি নাই—তাকে বলে অনাসঙ্গ ভজন। এই অনাসঙ্গ ভজন দ্বারা কোনভাবেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না। সাধক অনাসঙ্গ সাধনে মুক্তিও পায় না, ভুক্তিও পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : ১৯৫৪ ॥ ভুক্তি এবং মুক্তি এই শব্দ দুইটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তর : ভুক্তি শব্দের অর্থ ভোগ। ইহকালের সুখ-সম্পদ এবং পরকালের স্বর্গাদি সুখ-ভোগ ইত্যাদিকে ভুক্তি বলা হয়। আর মুক্তি বলতে সাধারণত সাষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য ইত্যাদি মুক্তি বুঝায়।

প্রশ্ন : ১৯৫৫ ॥ কৃষ্ণের কাছে ভুক্তি-মুক্তির পাশাপাশি প্রেমভক্তি চাওয়া যায় কি? চাইলে কি তিঁনি দেন?

উত্তর : ভক্ত যদি কৃষ্ণের কাছে প্রথমে ভুক্তি ও মুক্তি চান, তবে কৃষ্ণ এরূপ বস্তু দিয়ে তাকে আর প্রেম ভক্তি দেন না। এরূপ ভক্তের কাছে তিনি তাঁর প্রেম ভক্তিকে লুকাইয়া রাখেন। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তির ও মুক্তির বাসনা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হৃদয় ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করতে পারে না—অর্থাৎ সেই হৃদয় ভক্তি ধারণে অসমর্থ। তাই যারা ভুক্তি-মুক্তি পেয়েই সন্তুষ্ট তারা কৃষ্ণের প্রেমভক্তি পান না। যাদের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তির বাসনা নাই এবং এমনকি শ্রীকৃষ্ণ দিতে চাইলেও যারা তা গ্রহণ করেন না—তারাই প্রেমভক্তি লাভ করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৯৫৬ ॥ কৃষ্ণপ্রেমকে সুদূর্লভ বলা হয় কেন?

উত্তর : বেশীরভাগ মানুষের মনে ভুক্তি এবং মুক্তির বাসনা থাকে। এরূপ বাসনা সহজে কাটানো সম্ভব নয়। আবার এই বাসনা দুইটি দৃঢ় হলেও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য কৃষ্ণপ্রেমকে সুদূর্লভ বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯৫৭ ॥ বর্তমান শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রথম নাম ছিল শ্রীচৈতন্য মঙ্গল। নাম পরিবর্তনের কারণ কি?

উত্তর : শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর লিখিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম প্রথমে রেখেছিলেন শ্রীচৈতন্য মঙ্গল। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও একখানা বই শ্রীচৈতন্য মঙ্গল নামে লিখেছিলেন। কথিত আছে, একদিন শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কাছে এসে শ্রীলোচনদাস ঠাকুর নিজের রচিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ শুনার জন্য অনুরোধ করেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সম্মতিক্রমে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল পাঠ করতে করতে এক স্থানে যখন

শ্রীলোচনদাস পড়লেন, "অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিনীর সূত।" এই কথা শুনেই শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রেমে পুলকিত হয়ে লোচনদাসকে অলিঙ্গন করে বলেন—"নিতাই চৈতন্যে তোমার অভেদ-জ্ঞান হইয়াছে, তুমি ধন্য। আজ হইতে তোমার রচিত গ্রন্থের নামই শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রহিল; আর আমি যে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল লিখিয়াছি তাহার নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইল।" আবার কেউ কেউ বলেন, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত রাখেন। অন্যেরা বলেন শ্রী লোচনদাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের সাথে তাদের গোলযোগ হবে মনে করে বৃন্দাবনদাসের মা শ্রীনারায়নীদেবীই বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত রাখেন।

প্রশ্ন : ১৯৫৮ ॥ শ্রীবৃন্দাবনদাসকে চৈতন্য লীলার বেদব্যাস বলা হয় কেন?

উত্তর : বেদব্যাস যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করেন, শ্রীলবৃন্দাবন দাসও তেমনি তাঁর শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনা করেন। এই জন্য শ্রীলবৃন্দাবন দাসকে শ্রীচৈতন্য লীলার বেদ-ব্যাস বলা যায়। গৌর গনোদ্দেশ দীপিকা ((১০৯) গ্রন্থও বলেন, যিনি বেদব্যাস ছিলেন তিনিই এক্ষনে বৃন্দাবনদাস।

প্রশ্ন : ১৯৫৯ ॥ মহাপ্রভু নিজে সরাসরি কোন ভক্তকে নিজের উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ দিতেন না। অথচ শ্রীবৃন্দাবনদাসের মাকে তাই দিয়েছিলেন। কেন?

উত্তর : শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের এক ভাইয়ের মেয়ের নাম ছিল নারায়ণী। এই নারায়ণীই শ্রীবৃন্দাবনদাসের জননী ছিলেন। নারায়ণীর বয়স যখন চার বছর তখনই মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি প্রেমে আপ্লুত হয়ে **"কৃষ্ণ কৃষ্ণ"** বলে কান্না করেছিলেন। এই জন্য অত্যন্ত প্রীত হয়ে মহাপ্রভু কৃপা করে তাঁকে নিজের উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশেষ) দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৬০ ॥ শ্রীচৈতন্য লীলাতো শ্রীচৈতন্য ভাগবতেই আছে। তারপর আবার কি কারণে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখলেন? এর কোন প্রয়োজন ছিল কি?

উত্তর : শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রথমে অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে শ্রী চৈতন্য লীলার উল্লেখ করেন। পরে আবার কোন কোন লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। নানা কারণে তিনি সমস্ত লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতের লীলা-বর্ণন-মাধুর্যের আস্বাদন পেয়ে সমস্ত লীলা আস্বাদনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহ হয়। তাই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যেসব লীলা বর্ণনা করেন নাই, সেই সকল লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার জন্য তাঁরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করেন। সেই অনুসারে তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখেন।

প্রশ্ন : ১৯৬১ ॥ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ বা অন্ত্যলীলার বর্ণনা নাই কেন?

উত্তর : এর কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (আদি ৪২-৪৪) বর্ণনা করেছেন। শ্রী নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐ লীলায় আবিষ্ট হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তিনি আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শেষ বা অন্ত্যলীলার বর্ণনা করতে পারেন নাই।

প্রশ্ন : ১৯৬২ ॥ কল্পবৃক্ষ কি? এর কাজ কি?

উত্তর : কল্পবৃক্ষ একটি অপ্রাকৃত বৃক্ষ। এর ফল, মূল, শাখা, পাতা, কাণ্ড ইত্যাদি সমস্তই অপ্রাকৃত মণি-মাণিক্য তুল্য, সমুজ্জল এবং অপ্রাকৃতগুণ বিশিষ্ট। শ্রী শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলার জন্য যখন যা দরকার এই অপ্রাকৃত কল্পবৃক্ষ তখনই তা দিতে সক্ষম। এক কথায় একে একটি অচিন্ত্য-শক্তি বিশিষ্ট বৃক্ষ বলা যায়।

প্রশ্ন : ১৯৬৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণের ৫০টি গুণের মধ্যে নাকি ২৯টি গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হতে পারে?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সত্যবাক্ থেকে আরম্ভ করে হ্রীমান পর্যন্ত যে কয়টি গুণ কৃষ্ণের আছে পণ্ডিতগণ কৃষ্ণভক্তেও সেইসব গুণ আছে

বলে উল্লেখ করেন। এভাবে ২৯টি গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হতে পারে। তবে এই ২৯টি গুণের মধ্যেও আবার কোনটি পূর্ণমাত্রায় ভক্তের মধ্যে বিকাশিত হয় না। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** (১/১২) বইতে বলেন যে জীবের মধ্যে উক্ত গুণসমূহ বিন্দু বিন্দু মাত্রই বিকশিত হয়।

প্রশ্ন : ১৯৬৪ ॥ শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের এত বিগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনার আগে কবিরাজ গোস্বামী সর্বপ্রথম শ্রী শ্রী মদন গোপাল বিগ্রহের আজ্ঞা নিতে গিয়েছিলেন?

উত্তর : শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রমুখ ছিলেন শ্রী কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। শ্রী কবিরাজ গোস্বামী রচিত **রঘুনাথ ভট্টাষ্টক** থেকে জানা যায় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁরা সবাই শ্রী মদনগোপলের সেবা করতেন। এর ফলে শ্রীমদন গোপাল হলেন শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর কুলাধি দেবতা। এজন্যই তিনি প্রথমেই মদনগোপালের আজ্ঞা প্রার্থনা করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৬৫ ॥ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে কৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুর বলা হয় কেন?

উত্তর : সাক্ষাৎভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু থেকেই জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছে। লৌকিক লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু তার দীক্ষা গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী থেকে এই প্রেম লাভ করেন এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে এই প্রেম লাভ করেন। কাজেই জীবের কৃষ্ণপ্রেম পাওয়ার ক্রমে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীই হলেন মূল। তাই তাঁকে কৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুর বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯৬৬ ॥ স্থাবর জীব এবং জঙ্গমজীব কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : যে জীব একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে না তাকে স্থাবর জীব বলে। যেমন গাছ। যে জীব একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করতে পারে তাকে জঙ্গমজীব বলা হয়। যেমন মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ১৯৬৭ ॥ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলা হল : শ্রীপাদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জন্মস্থান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। বিদ্যানিধি হল তাঁর উপাধি। নবদ্বীপেও তাঁর একটি বাড়ি ছিল। গঙ্গার প্রতি তাঁর এমন ভক্তি ছিল যে পায়ের স্পর্শ হবে—এই ভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করতেন না। গদাধর পণ্ডিত এঁর মন্ত্রশিষ্য। ব্রজলীলায় তিনি বৃষভানু রাজা ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৬৮ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পরিচয় কি?

উত্তর : গঙ্গাদাস ছিলেন মহাপ্রভুর আমলে ব্যাকরণের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। নবদ্বীপের বিদ্যানগরে তিনি বাস করতেন। তাঁর টোলে মহাপ্রভু বাল্যকালে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি বশিষ্ঠ মুনির প্রকাশ ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৬৯ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভু কার বাক্যদণ্ডেও সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন?

উত্তর : দামোদর পণ্ডিত। তিনি ব্রজলীলায় শৈব্যা ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর সাথে নীলাচল—অর্থাৎ পুরী ধামে থাকতেন। নীলাচলে মহাপ্রভু একজন বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন। এজন্য দামোদর পণ্ডিত প্রভুকে বাক্যদণ্ড বা উপদেশ দানের মাধ্যমে সেরূপ স্নেহ করতে নিষেধ করেন। এই ঘটনায় প্রভু দামোদর পণ্ডিতের নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা মনে করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন : ১৯৭০ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদোপাধান কে ছিলেন?

উত্তর : উপাধানের অর্থ হল বালিশ। কাজেই পাদোপাধান বলতে পা-বালিশ বুঝায়। মহাপ্রভুর পার্ষদ দামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই শঙ্কর পণ্ডিত নীলাচলে মহাপ্রভুর পদসেবা করতেন। রাত্রে পদসেবা করতে করতে তিনি মহাপ্রভুর পদতলেই শুইয়া পড়তেন এবং প্রভুও পা-বালিশের উপর লোক যেমন পা-রাখে তেমনি তার উপর পা রেখে ঘুমাতেন। এজন্য সকলে শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রভুর পাদোপাধান বলতেন।

প্রশ্ন : ১৯৭১ ॥ শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকে ভোজন করানো শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এই জানা সত্ত্বেও কেন শ্রী অদ্বৈত প্রভু যবন হরিদাসকে শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করাইয়া ছিলেন?

উত্তর : হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করলেও ভক্তির প্রভাবে তিনি সজ্জন মণ্ডলীর কাছে যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন। ভক্তিবলে তিনি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এজন্যই শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভু একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করে তাঁকে ব্রাহ্মণ থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করে শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৭২ ॥ শ্রীমুরারী গুপ্ত সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলা হল : ইনি নবদ্বীপে বাস করতেন, খুব পণ্ডিত লোক, ভাল চিকিৎসক, জাতিতে বৈদ্য। মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্ব থেকেই তিনি ভজন করতেন। তাঁর ইস্টদেব ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। ত্রেতাযুগে রামলীলায় তিনি হনুমান ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর লিখিত শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য চরিতাম্ নামক গ্রন্থ মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে বেশী বিখ্যাত ও পরিচিত। এই মুরারী গুপ্ত কৃপা করে যাকেই চিকিৎসা করতেন, তার রোগই সেরে যেত, আবার সেই সাথে সংসারের বন্ধনও ঘুচে যেত।

প্রশ্ন : ১৯৭৩ ॥ শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা কে ছিলেন?

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল : শ্রীঅনুপম বল্লভ ছিলেন শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। পিতামাতার দেওয়া নাম ছিল শ্রীঅনুপম। গৌরেশ্বর একে বল্লভ-মল্লিক উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৭৪ ॥ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী একসময় দুই-তিন পল মাঠা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। প্রশ্ন হল পল দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : আট তোলায় এক পল হয়। দাস গোস্বামী দুই-তিন পল মাঠা খেয়ে জীবনযাপন করতেন আর কিছু খেতেন না। কাজেই দুই এবং তিন পল তিন থেকে চার ছটাক (১ পোয়া = আধুনিক ওজন পরিমাপে ২৫০ গ্রাম) বুঝায়।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ ॥ গৌর পার্ষদ শ্রী অভিরাম দাস সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল : ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন ভগবান কৃষ্ণের শ্রীদাম-সখা। তিনি খুবই শক্তিশালী ছিলেন। যে পরিমাণ কাঠ বহন করতে ৩২ জন লোকের দরকার সেই পরিমাণ কাঠ তিনি একাই হাতে তুলে নিতে পারতেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাকে রাম দাস এবং অপর নাম অভিরাম নামে পরিচয় দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

রাম দাস-অভিরাম-সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈলা বাঁশী ॥
(চৈ. চ. আদি ১০/১১৪)

এক খণ্ড কাঠের মধ্যস্থলে কোন ভারী জিনিস বেঁধে দুইজনে দুই পাশে বহন করলে কাঠের ঐ খণ্ডকে সাঙ্গ বা সাঙ্গ্য বলে। এরূপে ষোলটি সাঙ্গের সমান যে কাঠ, তাকে ষোল সাঙ্গের কাঠ বলে। অর্থাৎ কাঠের যে খণ্ড বহন করতে ৩২ জন লোকের দরকার, সেইরূপ একখানা কাঠের খণ্ডকে ষোল সাঙ্গের কাঠ বলে। অভিরাম দাস এরূপ এক খণ্ড কাঠ অতি সহজেই হাতে তুলে নিয়ে বাঁশীর ন্যায় মুখের কাছে ধরে রাখতে পারতেন।

তাছাড়া তাঁর কাছে একটি চাবুক ছিল। এর নাম ছিল জয়মঙ্গল চাবুক। এই চাবুক দ্বারা তিনি পাষণ্ডীদের শাসন করে ভক্তিপথে নিয়ে আসতেন।

প্রশ্ন : ১৯৭৬ ॥ শ্রীগুরুদেবের সেবকতো শিষ্যের কাছেও মান্য। তাহলে কি করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীপাদের সেবক কাশীশ্বর এবং গোবিন্দকে নিজের সেবক করলেন?

উত্তর : শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তাঁর অপ্রকটের পূর্বে সেবক কাশীশ্বর এবং গোবিন্দকে আদেশ দিয়ে যান যেন তারা পরে শ্রীমন মহাপ্রভুর সেবা করেন। মহাপ্রভু প্রথমে অস্বীকার করলেও শেষে ভক্তদের অনুরোধে এবং বিশেষত গুরুদেবের আজ্ঞা থাকায় এঁদেরকে সেবক হিসাবে মেনে নেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য-ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিল আসিয়া ॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহা কারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে ॥
(চৈ. চ. আদি ১০/১৩৬/১৩৮)

প্রশ্ন : ১৯৭৭ ॥ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্যগণ এক সময় দুইমতের হয়েছিলেন কেন?

উত্তর : অদ্বৈত প্রভুর শিষ্যরা জ্ঞানমার্গী এবং ভক্তিমার্গী এই দুই দলভুক্ত ছিলেন। কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একসময় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে যোগবাশিষ্ঠের (বশিষ্ঠ প্রণীত যোগশাস্ত্র) ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর কারণ পরে সকলে অবগত হলেও—জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বাচক ব্যাখ্যা যে শ্রীঅদ্বৈতের মূল লক্ষ্য ছিল না—তা পরিষ্কারভাবে জানার পরেও তাঁর কিছু শিষ্য ভক্তিমার্গের বদলে জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করতে থাকেন। এই অবস্থার জন্য দৈব ব্যতীত অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়—

"প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥
(চৈ. চ. আদি ১২/৬)

প্রশ্ন : ১৯৭৮ ॥ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কতজন পুত্র ছিলেন?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর চারজন পুত্রের নাম পাওয়া যায় : শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীগোপাল এবং শ্রীবলরাম। কেউ কেউ বলেন স্বরূপ এবং জগদীশও শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র ছিলেন (দেবকীনন্দপ্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ)। শ্রীমাখন লাল ভাগবতভূষণ বলেন, "অদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ, গোপাল, বলরাম এবং রূপ এই পঞ্চ পুত্র। জগদীশ নামে এক শাখা।"

প্রশ্ন : ১৯৭৯ ॥ বৈষ্ণব শাস্ত্রে দণ্ড ও প্রসাদ নামে দুইটি শব্দ দেখি। এদের তাৎপর্য কি?

উত্তর : দণ্ড-প্রসাদ বলতে দণ্ডরূপ অনুগ্রহ বুঝায়। অর্থাৎ প্রথমে শাস্তি দিয়ে সংশোধন করানোর পর অনুগ্রহ করলে তাকে দণ্ড-প্রসাদ বলা হয়। যেমন শ্রীমন্ মহাপ্রভু কোন এক সময় কোন এক অপরাধে তাঁর ভক্ত মুকুন্দ দত্তকে দর্শন দেন নাই। এই দর্শন না দেওয়াই দণ্ড। পরে আবার তাকে অনুগ্রহ করেছিলেন। এই হল অনুগ্রহ বা কৃপা। আবার দেখা যায় অদ্বৈত প্রভুর কাছে কোন এক কারণে শচীমাতার অপরাধ ছিল। এজন্য প্রথমে মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য নিজের মাকেও প্রেমদান করেন নাই। এই হল দণ্ড। পরে অদ্বৈত প্রভুর কাছে অপরাধ মোচনের পর মাকে প্রেমদান করেছিলেন—এই হল কৃপা বা প্রসাদ।

প্রশ্ন : ১৯৮০ ॥ কবিরাজ গোস্বামীতো শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা নিজে দর্শন করেন নাই। তবে তিনি কিভাবে মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা এত নিপুনভাবে বর্ণনা করতে পেরেছেন?

উত্তর : শ্রী মুরারী গুপ্তের কড়চায় প্রভুর আদি লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। আর স্বরূপ দামোদরের কড়চায় প্রভুর শেষলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। রঘুনাথদাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের সাথে থেকে নীলাচলে শেষ ১৬ বছর প্রভুর সেবা করেন। প্রভুর এবং স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। তিনিও লীলা সঙ্গীরূপে প্রভুর অন্ত্যলীলা নিজে দর্শন করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মুখেও প্রভুর অন্ত্যলীলা সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারেন। এছাড়াও শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীগণও প্রভুর অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁদের কাছ থেকেও কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লীলা সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পেরেছেন। কবিরাজ গোস্বামী উপরোক্ত বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকেই তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এতে তাঁর নিজের কল্পিত কিছুই নেই।

প্রশ্ন : ১৯৮১ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একনাম গৌরহরি। তাঁর এই নাম কিভাবে হয়?

উত্তর : মহাপ্রভু জন্ম-লীলার সময় থেকেই নবদ্বীপের নারী-পুরুষ সকলকেই হরিনামে আনন্দ দিতেন। বর্ণ ছিল গৌর। আর হরিনামে তিনি আনন্দ পেতেন। তাই নবদ্বীপের নারীগণ হাসতে হাসতে তাকে "গৌরহরি" বলতেন। সেই থেকেই তাঁর এক নাম গৌরহরি হয়।

'গৌরহরি' বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম, গৌরহরি ॥

(চৈ. চ. আদি ১৩/২৩)

প্রশ্ন : ১৯৮২ ॥ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী পূর্বলীলায় কে কে ছিলেন?

উত্তর : দ্বাপর লীলার শ্রীনন্দ মহারাজই কলিযুগে শ্রীজগন্নাথ মিশ্ররূপে অবতীর্ণ হন। তবে শ্রী বসুদেবও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রে প্রবেশ করেছেন।

দ্বাপর লীলার শ্রী যশোদা মাতাই কলিযুগে শ্রী শচীদেবীরূপে অবতীর্ণ হন। তবে দেবকী দেবীও তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৮৩ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে নবদ্বীপে কি কোন বৈষ্ণব ছিল না? থাকলে তাঁরা তখন কি করতেন?

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলা হল : মুরারীগুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত আচার্যসহ বেশ কিছু বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সভাতেই তৎকালীন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মিলিত হয়ে ভগবৎ-কথা আলোচনা করতেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য গীতা-ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যায় কর্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যা দিতেন।

প্রশ্ন : ১৯৮৪ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মের মাস, তিথি এবং শকাব্দ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ফাল্গুন মাসের কোন্ তারিখে, কি বারে তিনি জন্মলীলা প্রকট করেছিলেন?

উত্তর : এই সম্পর্কে কোন তথ্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে ১৩৩৬ সালের পৌষ মাসের প্রবাসী নামক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত

যোগেশ চন্দ্র রায় "কবি শকাঙ্ক" নামক এক নিবন্ধে লেখেন : "১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল। সে রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া ছিল।" এই সম্পর্কে পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন, "উক্ত (১৪০৭) শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২৩শে ফাল্গুন শনিবার। পূর্ণিমা নবদ্বীপে প্রায় ৪০ দণ্ড। দিনমান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি।" এই বক্তব্য অনুসারে বুঝা যায় ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৮৫ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভু কার কার কাছ থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন?

উত্তর : শ্রী কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য (৩/১-৩) থেকে দেখা যায় প্রথমে সুপণ্ডিত বিষ্ণু এবং আনন্দভাজন সুদর্শন-এই দুই জন অধ্যাপকের নিকট এবং তারপর ব্যাকরণের বিখ্যাত শিক্ষক শ্রী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে প্রভু অধ্যয়ন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৮৬ ॥ মহাপ্রভু অনুরোধ করার আগে কি শচীমাতা একাদশীব্রত পালন করতেন না?

উত্তর : কেউ কেউ বলেন শচীদেবী একাদশী ব্রত পূর্ব থেকেই করতেন। শুধুমাত্র জীবকে শিক্ষা দেয়ার জন্য উপলক্ষ্য করে প্রভু মাতাকে একদশী ব্রত করার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

"প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা।
শচী বোলেন—না খাইব, ভালই কহিলা
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥"

(চৈ. চ. আদি ১৫/৭-৮)

উপরোক্ত শ্লোক থেকে অনেকে মনে করেন শচীমাতা পূর্বে একাদশী ব্রত পালন করতেন না। একদিন প্রভু মাতার চরণে প্রণাম করে একাদশীতে অন্ন ত্যাগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করেন। মা তাতে স্বীকৃত হলেন এবং তারপর থেকেই একাদশী ব্রত আরম্ভ করেন।

প্রশ্ন : ১৯৮৭ ॥ সধবার অর্থাৎ বিবাহিতা নারীর জন্য নাকি একাদশী ব্রত পালনের নিয়ম নাই। এই সম্পর্কে শাস্ত্র কি বলে?

উত্তর : অনেকের মধ্যে একটি সংস্কার আছে যে সধবার পক্ষে উপবাস কর্তব্য নয়। এই মতের পক্ষে একটি স্মৃতি শাস্ত্রের বচনও আছে : **"পতৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রত করেৎ আয়ুঃ সা হরতি ভর্ত্তু নরকঞ্চৈব গচ্ছতি"**—অর্থাৎ স্বামী জীবিত অবস্থায় যে নারী উপবাস-ব্রতের আচরণ করে সে তার স্বামীর আয়ু হরণ করে নরকে গমন করে। এই স্মৃতিবাক্য উল্লেখ করে কিছু লোক সধবা নারীর পক্ষে একাদশীর উপবাসও নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু স্মৃতির উপরোক্ত বচনে সধবার পক্ষে যে ব্রত-উপবাসের নিষেধ করা হয়েছে তা একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রত-উপবাস সম্পর্কে। একাদশী ব্যতীত অন্য উপবাস করবে না—কিন্তু একাদশীর ব্রত-উপবাস করবে—এই হল উপরোক্ত স্মৃতি শাস্ত্রের বচনের তাৎপর্য। তা নাহলে অন্য শাস্ত্র প্রমাণের সাথে উক্ত বচনের বিরোধ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

শ্রী হরিভক্তি বিলাসে (১২/৬) বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষে একাদশী ব্রত করণীয়। এছাড়া **বিষ্ণু ধর্মোত্তর** শাস্ত্রেও বলা হয়েছে : ভক্তিযুক্ত হয়ে স্ত্রী, পুত্র স্বজনসহ উভয় পক্ষীয় একাদশীব্রত পালন করবে। এই বচনে স্ত্রী কথা থাকায় সধবার উপবাসের বিধিও পাওয়া গেল। আবার শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁর সধবা মাতা শচীদেবীকে একাদশী ব্রত উপবাসের জন্য অনুরোধ করেন এবং সেই সময় থেকেই তিনি একাদশীব্রত আরম্ভ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৮৮ ॥ একাদশী দিনে পিতামাতা অথবা অন্য যে কারও শ্রাদ্ধ করলে পরিণতি কি হবে?

উত্তর : শ্রীহরিভক্তি বিলাস, স্কন্দ পুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র গ্রন্থ অনুযায়ী একাদশী ব্রত দিনে যদি শ্রাদ্ধের তারিখ পড়ে, তবে সেই দিন শ্রাদ্ধ না করে পরের দিন অর্থাৎ পারনের দিন শ্রাদ্ধ করতে হবে। কখনো উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়। ব্রত দিনে শ্রাদ্ধ করলে দাতা, ভোক্তা এবং প্রেত (যার মৃত্যু হয়েছে) তিনজনই নরকে গমন

করবে। উপবাস যদি দ্বাদশী দিনে হয় তবে উপবাস দিনে (একাদশীব্রত দিনে) শ্রাদ্ধ না করে ত্রয়োদশীতে—অর্থাৎ পারন দিনে শ্রাদ্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন : ১৯৮৯ ॥ শ্রাদ্ধের দিন যে ভাতসরা (মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অন্নব্যঞ্জন সহযোগে দ্রব্যাদি অর্পন) দেয়া হয় তাতে কি মৃতব্যক্তির আত্মা প্রেত দেহ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে? যদি না পারে তবে করণীয় কি?

উত্তর : বেশীরভাগ লোকই মৃতব্যক্তি বেচে থাকার সময় যে যে জিনিস খেতে ভালবাসতো ঐ সব দ্রব্য সহযোগে ভাতসরা দেন। এতে প্রেতাত্মার মুক্তি লাভের পরিবর্তে বরং জড়জগতের প্রতি মোহ উৎপন্ন হয়। তাছাড়া এতে তার মুক্তিও হয় না। শাস্ত্র বলেন, শ্রাদ্ধের দিন প্রথমতঃ ভগবানকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি নিবেদন করে সেই নিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করবেন। এরপর ঐ নিবেদিত অন্ন মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে দিতে হবে। তাহলে অক্ষয় লাভ করা যায়। (শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ৯/৮৪ এবং ৯/৮৭)। **ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে** বলা হয়েছে শ্রাদ্ধকালে ভক্তি সহকারে ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও সেই সাথে তুলসী সমন্বিত পিণ্ড মৃত ব্যক্তিকে অর্পন করলে ঐ ব্যক্তি কোটীকল্প (১ কল্প = জড়জগতের ৪৩২ কোটী বছর) পর্যন্ত সম্যক তৃপ্তি লাভ করেন।

প্রশ্ন : ১৯৯০ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী পূর্বলীলায় কি ছিলেন?

উত্তর : গৌরগনোদ্দেশ দিপীকা (৪৫) গ্রন্থ অনুযায়ী বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী লক্ষ্মী, জানকী এবং রুক্মিনী—এঁদের মিলিত বিগ্রহই দিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী।

প্রশ্ন : ১৯৯১ ॥ বৈষ্ণবের জন্য সর্বোত্তম সাধ্য-সাধন তত্ত্ব কি?

উত্তর : তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে তপন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি যেসব উপদেশ বলেছিলেন তা থেকে দেখা যায় কৃষ্ণসেবাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং নাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন।

প্রশ্ন : ১৯৯২ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী কিভাবে অপ্রকট হয়েছিলেন?

উত্তর : শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা থেকে দেখা যায়—লক্ষ্মীদেবী একদিন ঘরে অবস্থান করছেন, এমন সময় একটি সাপ এসে তাঁর পাদমূলে দংশন করে। শচীদেবী জানতে পেরে বিভিন্ন ওঝা এনে নানাবিধ উপায়ে বিষ অপসারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তখন একেবারে হতাশ হয়ে প্রতিবেশী মহিলাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুত্রবধুকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যান এবং তুলসীদামে তাঁকে বিভূষিত করে শ্রীহরিনাম কীর্তন করতে থাকেন। এই কীর্তনের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম স্মরণ করতে করতে লক্ষ্মীদেবী লীলা সম্বরণ করেন। (শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম ১/১১/২১-২৬)।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অনুযায়ী পতির বিরহ সহ্য করতে না পেরে লক্ষ্মীদেবী অপ্রকট হন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥
(চৈ. চ. আদি ১৬/১৯)।

প্রশ্ন : ১৯৯৩ ॥ যে রমনী স্বামীর আগেই মৃত্যুবরণ করে সে নাকি ভাগ্যবতী? এই সম্পর্কে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : সমাজে এরূপ কথা কোথায়ও কোথায়ও প্রচলিত আছে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সবকিছু হয়। তবে লক্ষ্মীদেবীর অপ্রকট হেতু শচীদেবী শোক করায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাকে যে কথা বলেছিলেন তা এখানে বলা যায়—

স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী ॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি ১২)

প্রশ্ন : ১৯৯৪ ॥ সর্বজ্ঞ হয়েও মহাপ্রভু তাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে অন্তর্ধান করাইলেন কেন? আর এরূপ করানোর ইচ্ছা থাকলে তাঁকে বিবাহ করলেন কেন?

উত্তর : গৌরগনোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী লক্ষ্মীপ্রয়া দেবী ছিলেন জানকী এবং রুক্মিনীর মিলিত রূপ। রুক্মিনীদেবী সাক্ষাৎ দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণের কান্তা। জানকীদেবী শ্রীকৃষ্ণের অংশ শ্রীরামচন্দ্রের কান্তা। কাজেই বস্তুত তিনিও শ্রীকৃষ্ণের কান্তা। উভয়ের মিলিত স্বরূপ লক্ষ্মীদেবী যখন আবির্ভূত হন তখন গৌর-কৃষ্ণ তাঁকে অবশ্যই বিবাহ করবেন। গৌরগনোদ্দেশ দিপীকার মতে বিষ্ণুপ্রিয়া হলেন পূর্বলীলার সত্যভামাদেবী। তিনি যখন আবির্ভূত হন তখন গৌর-কৃষ্ণ তাঁকেও অবশ্যই বিয়ে করবেন। কিন্তু জানকী এবং সত্যভামার একত্র অবস্থান প্রভুর কাছে অবাঞ্ছনীয় বলেই মনে হয় তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়া রূপ জানকীকে আগে অন্তর্ধান করান। জানকীদেবী হলেন একপত্নীব্রত শ্রীরাম চন্দ্রের কান্তা। সপত্নী সহবাস তাঁর অভিপ্রেত হবে না বলেই বোধ হয় প্রভু সত্যভামা এবং জানকীর একত্রে স্থিতি অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছেন। (উৎস : ড. রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, পৃ. ৭০৩)।

প্রশ্ন : ১৯৯৫ ॥ মহাপ্রভু এক সময় নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। তা কিরূপ ছিল?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মতে (আদি ১৭/১১) শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে যে ষড়ভূজরূপ দেখান, তাঁর এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, এক হাতে পদ্ম, এক হাতে শার্ঙ্গ ধনু এবং এক হাতে বেনু ছিল। শঙ্খ, চক্র, পদ্ম এবং গদা—এই চারটি দ্বারকানাথ কৃষ্ণের অস্ত্র, শার্ঙ্গ হল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম। বেনু হল ব্রজনাথের বৈশিষ্ট্য। কাজেই এই ষড়ভূজ বিনিষ্ট মূর্ত্তি ছিল দ্বারকানাথ, মথুরানাথ এবং ব্রজনাথের মিলিত বিগ্রহ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন, প্রভুর ছয় হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল এবং মূষল ছিল। হল ও মূষলের পরিবর্তে কবিরাজ গোস্বামী সার্ঙ্গ ও বেনু

লিখেছেন। হল ও মূষল হল শ্রীবলরামের অস্ত্র। এই বর্ণনা অনুযায়ী ষড়ভূজ ছিলেন কৃষ্ণ-বলরামের মিলিত বিগ্রহ।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর কি কি রূপ দর্শন করাইয়া ছিলেন?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (আদি ১৭/১১-১২) অনুযায়ী তিনি তিন ধরনের রূপ দেখান।

১. প্রথমে শঙ্খ, চক্র-পদ্ম-গদা-শার্ঙ্গ-বেনুধারী ষড়ভুজ মূর্ত্তি।
২. দ্বিতীয়ে শঙ্খ, চক্র, এবং বেনুধর মূর্ত্তি। এই চতুর্ভূজের এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র ছিল আর দুই হাতে তিনি বেনু বাজাইতে ছিলেন।
৩. তৃতীয়ে দ্বিভূজ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপ দেখান।

প্রশ্ন : ১৯৯৭ ॥ হরিনাম করার আগে নাকি নিজেকে তৃনের চেয়েও নীচ এবং অভিমান শূন্য হয়ে অপরকে সম্মান দিতে হবে। আবার একই সাথে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হতে হবে। এসব কি প্রথমেই কোন লোকের পক্ষে হওয়া সম্ভব? তাহলে উপায় কি?

উত্তর : "হরের্ণাম"—এই শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে কলিতে যখন অন্য কোন গতিই নাই, তখন জীব যেভাবেই থাকুক না কেন, সেইভাবেই প্রথমে হরিনাম করবে। নামের প্রভাবেই একসময় তৃণ থেকে নীচ হবে। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হবে। তবে এ ব্যাপারে যত্ন এবং অভ্যাসও করতে হবে। তাহলেই নামের প্রভাবে উপরোক্ত গুণসমূহ একসময় এসে উপস্থিত হবে।

প্রশ্ন : ১৯৯৮ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে কোন এক সময় নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন যে তাঁর সংসার সুখ বিনষ্ট হবে। কেন? এতে মহাপ্রভুর কি প্রতিক্রিয়া হয়?

উত্তর : এই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর কীর্তন দেখার জন্য শ্রীবাসের গৃহে যান। কিন্তু দ্বার বদ্ধ থাকায় কীর্তন স্থলে প্রবেশ করতে পারেন নাই। সেজন্য দুঃখে এবং অভিমানে উপরোক্ত অভিশাপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপ শুনে মহাপ্রভুর মনে কোন রাগ না

হয়ে উল্লাস বা আনন্দ হয়। কারণ তিনি মনে করলেন ব্রাহ্মণের শাপে যদি আমার সংসার সুখ চলে যায়, আমার মনকে আর আকৃষ্ট না করে তবে আমি নিশ্চিন্ত মনে একান্তভাবে ভগবদ্ ভজন করতে পারবো। এই কথা চিন্তা করেই প্রভুর মনে উল্লাস হয়েছিল।

প্রশ্ন : ১৯৯৯ ॥ একসময় গোপীগণের সম্মুখে চতুর্ভূজ মূর্ত্তি ধারণ করলেও শ্রীরাধার সাক্ষাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর চতুর্ভূজ মূর্ত্তি রক্ষা করতে পারেন নাই?

উত্তর : বসন্তরাসের সময় একপর্যায়ে রাধারানী অভিমান করে রাসস্থলী ত্যাগ করলে কৃষ্ণও তাকে অনুসরণ করেন। অপরাপর গোপীরা কৃষ্ণ অনুসন্ধানে বের হয়ে একসময় কৃষ্ণের চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দেখতে পান। কিন্তু রাধার সম্মুখীন হলে কৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভূজ মূর্ত্তি রক্ষা করতে পারেন নাই। এর মূল কারণ হল শ্রীরাধার প্রেমের অদ্ভুত প্রভাব। যে স্থলে শুদ্ধ-মাধুর্য প্রেমের বিকাশ যত বেশি সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ততই প্রেমের অধীন হন। তখন তাঁর ঐশ্বর্যের বিকাশ কমতে থাকে। শ্রীরাধা হলেন কৃষ্ণ প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ। কাজেই তাঁর কোনরূপ ইঙ্গিত ছাড়া, তাঁকে চমৎকৃত বা অবাক করার জন্য ঐশ্বর্যের বিকাশ একেবারেই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : ২০০০ ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে আবার তিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলেন কেন?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। এজন্য কোন কোন সময় তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে নিজেকে শ্রীরাধা ভাবেন। এই ভাবের বশেই তখন তিনি ব্রজেন্দ্র নন্দনকে **প্রাণনাথ** বলে সম্বোধন করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়—

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্র নন্দনে কহে—প্রাণনাথ করি ॥
(চৈ. চ. আদি ১৭/২৯৪)

প্রশ্ন : ২০০১ ॥ কর্ম এবং কর্মযোগের মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ রয়েছে। কর্ম হল ফলভোগের নিমিত্ত অনুষ্ঠানকারীর নিয়ন্ত্রিত কর্ম। কিন্তু কর্মযোগ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভক্তের কার্যকলাপ। কর্মযোগের ভিত্তি হল ভক্তি বা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান। কিন্তু কর্মের ভিত্তি হচ্ছে অনুষ্ঠানকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন।

প্রশ্ন : ২০০২ ॥ পুত্রমাত্রেই কি গয়ায় পিণ্ডদান করে পতিত পিতাকে উদ্ধার করতে পারে?

উত্তর : পুত্রকে বলা হয় অপত্য—অর্থাৎ যে পিতাকে পতন থেকে রক্ষা করে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পিতার আত্মার সদ্‌গতি কামনার জন্য শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করেন। তারপর পুত্র গয়ায় গিয়ে বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে যজ্ঞ নিবেদন করার মাধ্যমে পিতার আত্মাকে পাপমুক্ত করতে পারেন যদি পিতা পতিত হন। কিন্তু পুত্র যদি বিষ্ণুবিদ্বেষী হয় তাহলে সে কিভাবে বিষ্ণুর পাদপদ্মে নৈবেদ্য নিবেদন করবে?

প্রশ্ন : ২০০৩ ॥ গৃহস্থ এবং গৃহমেধীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : শাস্ত্রে গৃহীদেরকে গৃহস্থ এবং গৃমেধী—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গৃহস্থ হলেন তারা যারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ গৃহে অবস্থান করলেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য পারমার্থিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে জীবনযাপন করেন। আর গৃহমেধী হল তারা যারা নিজের এবং আত্মীয় স্বজনদের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই কেবল নিমগ্ন থেকে মাৎসর্যপূর্ণ (হিংসাপূর্ণ) জীবনযাপন করে। মেধী শব্দের অর্থ হল অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। গৃহমেধীরা কেবল তাদের পরিবারের স্বার্থে মগ্ন থাকায় অন্যদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হয়। তারা জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের কথা পুরাপুরি ভুলে যায়। কলিযুগে গৃহে অবস্থানরত এদের সংখ্যাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার মাৎসর্যপরায়ণ গৃহমেধীরা নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতিক্রিয়ায় তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রতিপালনের জন্য শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় সারাজীবন অতিবাহিত করে।

যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে এরাই জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যধিজনিত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়।

প্রশ্ন : ২০০৪ ॥ শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতাকে কোন্ অর্থে ভগবানের অবতার এবং শ্রীমদ্ ভাগবতকে ভগবানের প্রতিনিধি বলা হয় বা যায়?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্ম সম্মিতম বলা হয়। কেননা তা হল শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার মতো শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা শব্দরূপে ভগবানের অবতার। কারণ ভগবান স্বয়ং তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ ভগবদগীতা দান করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। কারণ ভগবানের অবতার কর্তৃক ভগবানের দিব্য কার্যকলাপই শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ২০০৫ ॥ নাম অপরাধ কি এবং তা কত প্রকার?

উত্তর : ভগবানের পবিত্র নামের চরণে অপরাধ করলে তাকে নাম অপরাধ বলা হয়। পদ্মপুরাণে দশ প্রকারের নাম অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. প্রথম অপরাধ হল যে সব মহান ভক্ত ভগবানের মহিমা প্রচার করেন তাঁদের নিন্দা করা।
২. দ্বিতীয় অপরাধ, জড় জাগতিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের পবিত্র নামকে দর্শন করা। ভগবানের সমস্ত নামই ভগবানের মতো পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন এবং মঙ্গলময়। সেই নামকে কখনো জড়জাগতিক বস্তু বলে মনে করা উচিত নয়।
৩. তৃতীয় অপরাধ হল সদ্‌গুরু বা আচার্যদের নির্দেশ অবজ্ঞা করা।
৪. চতুর্থ অপরাধ, বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করা।
৫. পঞ্চম অপরাধ, জড় বিচারের মাধ্যমে ভগবানের দিব্য নামের অর্থ নিরূপণ করা। কারণ ভগবানের নাম ও ভগবান একই। এই ভগবানের নামকে ভগবান থেকে অভিন্ন বলে জানা উচিত।

৬. ষষ্ঠ অপরাধ হল কল্পনার দ্বারা ভগবানের নামের ব্যাখ্যা প্রদান। কারণ ভগবান কাল্পনিক নন এবং তাঁর পবিত্র নামও কাল্পনিক নয়।
৭. সপ্তম অপরাধ হল নামের বলে পাপ আচরণ করা। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যারা এই সুযোগ গ্রহণ করে পাপ আচরণ করতে থাকে ও মনে করে যে ভগবানের নাম আবার কীর্তন করলেই তাদের পাপ মোচন হয়ে যাবে তারা নাম-প্রভুর চরণে সবচেয়ে বড় অপরাধী। এই প্রকার অপরাধীদের কোনভাবেই অপরাধ মোচন হয় না। ভগবানের নাম কীর্তনের পন্থা তাকে রক্ষা করবে না।
৮. অষ্টম অপরাধ হল ভগবানের নাম কীর্তনকে জড় জাগতিক পুণ্য কর্মের সমতুল্য মনে করা। অর্থাৎ জড়জাগতিক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় নাম-কীর্তনের পন্থা ব্যবহার করা উচিত নয়।
৯. নবম অপরাধ হচ্ছে নাম কীর্তনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের পবিত্র নামের দিব্য প্রকৃতির বিষয়ে উপদেশ দেয়া।
১০. দশম অপরাধ হল পবিত্র নামের দিব্য প্রভাব সম্পর্কে শ্রবণ করা সত্ত্বেও ভগবানের নামের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ না হওয়া।

প্রশ্ন : ২০০৬ ॥ সন্ন্যাস আশ্রমের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : সন্ন্যাস আশ্রম ভিক্ষা করার জন্য পরজীবির মতো অন্যের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করার জন্য নয়। সন্ন্যাস আশ্রমের উদ্দেশ্য হল সমাজের উন্নতিকল্পে সমাজকে কিছু দেয়া, গৃহস্থদের রোজগারের উপর নির্ভর করা নয়। প্রকৃতপক্ষে, গৃহস্থদের কাছ থেকে প্রকৃত সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণ করার যে ব্যবস্থা, সেটি দাতার প্রকৃত পরমার্থ লাভের জন্য মহাজনেরা করে গিয়েছেন। তাই শ্রদ্ধালু গৃহস্থদের দান করার যে প্রবণতা রয়েছে, তার সুযোগ নেয়া সন্ন্যাসীদের উচিত নয়। সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত ব্যক্তিদের মূল কর্তব্য হল আত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য সব ধরনের কার্যক্রমে নিয়োজিত হওয়া।

প্রশ্ন : ২০০৭ ॥ পরমেশ্বর ভগবানের পরিবর্তে অন্য দেবতার প্রতি আসক্তদের অবস্থান কোথায়?

উত্তর : শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সব মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য দেবতার প্রতি আসক্ত হয় তারা ঠিক বিভ্রান্ত পশুর মতো যারা এক পশু পালককে অনুসরণ করছে, যে তাদের কসাইখানায় নিয়ে যাচ্ছে। কারণ এসব জড়বাদীও পশুদের মতো জানে না যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তা অবহেলা করার ফলে তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে। মানুষ যখন জড় লাভের আশায় মোহাচ্ছন্ন হয় তখন সে বিশেষ কোন লাভের জন্য বিভিন্ন দেবতার কাছে আবেদন-নিবেদন করে, প্রকৃত পক্ষে যদিও তা ভ্রম (ভুল) এবং অনিত্য।

প্রশ্ন : ২০০৮ ॥ পরমেশ্বর ভগবানের প্রধান চব্বিশটি রূপ কি কি?

উত্তর : শঙ্খ, চক্র আদি প্রতীকের অবস্থানের তারতম্য অনুসারে অনেক রূপ রয়েছে। যথা—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, হৃষীকেশ, কেশব, মাধব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ, শ্রীধর, বাসুদেব, দামোদর, জনার্দন, নারায়ণ, হরি, পদ্মনাভ, বামন, মধুসূদন, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, অধোক্ষজ এবং উপেন্দ্র। অন্তর্যামী ভগবানের এই চব্বিশটি রূপ বিভিন্ন লোকে পুঁজিত হন। তাঁর এসব রূপ অদ্বৈত।

প্রশ্ন : ২০০৯ ॥ অর্ন্তযামী পরমাত্মার আয়তন কিরূপ?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (২/২/৮) বলা হয়েছে— সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার আয়তন প্রাদেশ পরিমাণ—অর্থাৎ প্রসারিত করতলের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পর্যন্ত বা প্রায় আট ইঞ্চি। এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবানের রূপটি বিভিন্ন প্রতীক যুক্ত—নীচের ডান হাত থেকে নীচের বাঁ হাত পর্যন্ত তাঁর হাতে যথাক্রমে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ এবং গদা রয়েছে। তাঁর এই রূপকে বলা হয় জনার্দন বা সাধারণ জীবের নিয়ন্ত্রণকারী ভগবানের অংশ বিশেষ।

প্রশ্ন : ২০১০ ॥ বৈরাগ্য জ্ঞান কি?

উত্তর : অবাঞ্চিত বস্তুর প্রতি অনাসক্তিই হল বৈরাগ্য। ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে বিভিন্ন প্রকার বাসনার নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানের অর্থ হল

বস্তু সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা। যদি বিচার পূর্বক জানা যায়, কোন্ কোন্ বস্তু অনাবশ্যক, তখন জ্ঞানবান ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই সেই সব অবাঞ্ছিত বস্তু ত্যাগ করে থাকেন। যখন বদ্ধ জীব জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, জড়জাগতিক আবশ্যকতাগুলো অবাঞ্ছিত, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই সেগুলোর প্রতি অনাসক্ত হন। জ্ঞানের এই স্তরকে বলা হয় বৈরাগ্য।

প্রশ্ন : ২০১১ ॥ কাদের সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়?

উত্তর : যাদের হৃদয়ে কামনা-বাসনা বর্তমান, তাদের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা সেই স্তরে উন্নীত না হলে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশ্নই উঠে না। তাই ক্রমান্বয়ে সৎ গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ ভক্তির অনুশীলন করে এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার মাধ্যমে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের পূর্বে অন্ততপক্ষে স্থূল যৌন বাসনাকে সংযত করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন : ২০১২ ॥ ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান কি শর্তবিহীন?

উত্তর : বুদ্ধি-বৃত্তির বিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে যে পরিমাণে যৌন-বাসনার উন্মত্ততা থেকে মুক্ত হওয়া যায় সেই অনুসারে ভগবানের শ্রীঅঙ্গের ধ্যানের প্রগতির তারতম্য হতে পারে। অর্থাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান হৃদয়ের পবিত্রকরণের মাত্রা অনুসারে হওয়া উচিত। মূল কথা হল যারা এখনও যৌনবাসনার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে জড়জীবনে আবদ্ধ, তাদের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের উর্দ্ধে ধ্যান করা উচিত নয়। যৌনবাসনা থেকে কতখানি মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে তা বিচার না করে কৃত্রিমভাবে উপরে উঠার—অর্থাৎ ভগবানের দিব্যরূপের উধ্বাঙ্গসমূহের ধ্যান করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন : ২০১৩ ॥ ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যানের স্তরসমূহ কি কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (২/২/১৩) বলা হয়েছে : ভগবানের শ্রীপাদ্ পদ্ম থেকে তার হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত।

প্রথমে তাঁর শ্রীপাদ্ পদ্মে মনকে স্থির করা উচিত। তারপর গুলফ্, তারপর জঙ্ঘা এবং এভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গের ধ্যান করা উচিত। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে ধ্যান ততই গভীরতা লাভ করবে।

প্রশ্ন : ২০১৪ ॥ যোগীরা কি উপায়ে দেহ ত্যাগ করেন?

উত্তর : সিদ্ধযোগী যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁর প্রাণ-বায়ুকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এই উপায়ে দেহত্যাগ করেন : তিনি পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে রুদ্ধ করে ধীরে ধীরে প্রাণ-বায়ুকে ক্রমান্বয়ে নাভি, হৃদয়, বক্ষস্থল, তালুমুখ, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে উন্নীত করে দেহত্যাগ করেন। তবে এই পদ্ধতিতে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রক্রিয়া তা যান্ত্রিক এবং একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এটি দৈহিক কার্যকলাপের মাধ্যমে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের চেষ্টা মাত্র।

প্রশ্ন : ২০১৫ ॥ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর বাসস্থান কোথায়?

উত্তর : ব্রহ্মাণ্ডের ধ্রুব নক্ষত্র এবং তার চর্তুপাশ্বস্থ চক্রকে বলা হয় শিশুমার চক্র। এখানে পরমেশ্বর ভগবানের (ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর) বাসস্থান অবস্থিত।

প্রশ্ন : ২০১৬ ॥ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু কি?

উত্তর : শিশুমার চক্র হল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে বলা হয় শ্রীবিষ্ণুর (গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর) নাভি। যথার্থ যোগীরাই কেবল শিশুমার চক্র অতিক্রম করে মর্হলোক প্রাপ্ত হন। এখানে ভৃগু প্রমুখ মহর্ষিরা ৪৩০ কোটি সৌর বছর ব্যাপী দীর্ঘায়ু উপভোগ করেন।

প্রশ্ন : ২০১৭ ॥ সৃষ্টি-তত্ত্ব কি?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী জড়া প্রকৃতির একটি অংশ ভগবান কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে মহত্তত্ত্ব নামে পরিচিত হয়। মহত্তত্ত্বের একটি অংশ হল অহংকার। অহংকারের একটি অংশ শব্দ এবং শব্দের একটি অংশ বায়ু। বায়ুর একটি অংশ পর্যবসিত হয় রূপে এবং রূপ থেকে তড়িৎ শক্তি বা তাপের উদ্ভব হয়। তাপ থেকে পৃথিবীর গন্ধ এবং এই গন্ধ থেকে স্থূল পৃথিবীর প্রকাশ হয়। এই সমস্তই একত্রে সৃষ্টি-তত্ত্ব।

সৃষ্টির ব্যাস ৪ শতকোটী মাইল। তারপর ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ শুরু হয়। প্রথম আবরণটি আটকোটি মাইল। তার পরবর্তী আবরণগুলি

যথাক্রমে জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ যা পূর্ববর্তী আবরণসমূহ থেকে দশগুণ বেশি প্রসারিত।

প্রশ্ন : ২০১৮ ॥ ভগবানের নামগ্রহণের কয়টি স্তর রয়েছে?

উত্তর : ভগবানের নাম গ্রহণের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হল অপরাধ মুক্ত অবস্থায় ভগবানের দিব্য নাম করা। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে নামাভাসের স্তর। তৃতীয়টি হল শুদ্ধ নাম গ্রহণের স্তর। দ্বিতীয় স্তরেই— অর্থাৎ অপরাধযুক্ত এবং অপরাধমুক্ত স্তরের মধ্যবর্তী নামাভাসের মাধ্যমে আপনা থেকে জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত স্তর লাভ হয়। আর নিরপরাধে ভগবানের নাম গ্রহণের ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় যদিও আপাতদৃষ্টিতে ভক্তের দেহ তখনও জড়-জগতে বিরাজ করে।

প্রশ্ন : ২০১৯ ॥ জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায় কি?

উত্তর : প্রথম পদক্ষেপ হল ভক্তিযোগের চরম গুরুত্ব সম্পর্কে হৃদয়ঙ্গম করা। জীব যখন তার বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সম্পাদন করতে গিয়ে পরম সৌভাগ্যবশত ভক্তিযোগের সম্পদ প্রাপ্ত হন তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবদ্ ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় নিষ্ঠাবান জীব ভগবানের প্রতিনিধি যথার্থ সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পান। সেই গুরুর নির্দেশ সঠিকভাবে অনুশীলনের ফলে জীব ভগবৎ ভক্তির বীজ পেতে পারেন। জীবকে এই বীজ হৃদয়রূপ ভূমিতে রোপন করতে হবে। তারপর ভগবানের দিব্য নাম, যশ ইত্যাদি শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে সেই বীজটিতে জল সিঞ্চন করতে হবে। এথেকে ভক্তিলতার উদ্ভব হবে এবং নিয়মিতভাবে জল সিঞ্চনের ফলে এই লতা ক্রমবর্ধিত হবে এবং একসময় জীব জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।

প্রশ্ন : ২০২০ ॥ জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিৎজগতে যাওয়ার কয়টি পন্থা রয়েছে?

উত্তর : জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিৎ জগতে ফিরে যাবার দুইটি পন্থা রয়েছে :

১. সদ্য-মুক্তি বা সরাসরি ভগবদ্‌ধামে ফিরে যাওয়া।

২. ক্রম-মুক্তি বা ধীরে ধীরে ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ থেকে উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে ভগবদ্‌ধাম প্রাপ্ত হওয়া।

যাঁরা হৃদয়ের সমস্ত জড়বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেন বা মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা মৃত্যুকে জয় করে ভগবদ্‌ধামে প্রবেশ করেন। একে বলা হয় সদ্যমুক্তি। আর অর্চনমার্গে ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর লোক অতিক্রম করে অবশেষে ভগবদ্‌ধামে উপনীত হওয়াকে ক্রম-মুক্তি বলে।

প্রশ্ন : ২০২১ ॥ বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরা বলতে পরমেশ্বর ভগবান থেকে জড়জগৎ পর্যন্ত বৈদিক জ্ঞানের ক্রমাম্বয় স্তর বুঝায়। এই জ্ঞানের পরম্পরা হল এই রকম : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক জ্ঞান প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে দান করেন, ব্রহ্মা তা নারদকে দান করেন, নারদ থেকে সেই জ্ঞান শ্রীল ব্যাসদেব এবং ব্যাসদেব থেকে শ্রীল শুকদেব তা প্রাপ্ত হন। এইভাবে গুরু-শিষ্যের পরম্পরায় বৈদিক জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

প্রশ্ন : ২০২২ ॥ জীবের বন্ধন মোচনের সর্বোত্তম বা মঙ্গলময় পন্থা কি?

উত্তর : এই ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রাম্যমান জীবদের ভগবানের প্রেমময়ী সেবার উপায় ছাড়া ভববন্ধন মোচনের আর কোন মঙ্গলময় পন্থা নেই। কারণ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মূল বক্তব্য হল সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন : ২০২৩ ॥ ব্রহ্মা কতবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন?

উত্তর : ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে বৈদিক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরপরও বেদের তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য যথার্থভাবে জানার জন্য গভীর মনোনিবেশসহকারে একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। (শ্রীমদ্ ভাগবত ২/২/৩৪)।

প্রশ্ন : ২০২৪ ॥ মানুষের ইন্দ্রিয় কয়টি এবং কি কি?

উত্তর : মানুষের তেরটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। এসব হল :

ক. পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় : ১. চক্ষু, ২. কর্ণ, ৩. নাসিকা, ৪. জিহ্বা এবং ৫. ত্বক।

খ. পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় : ১. বাক, ২. পানি, ৩. পদ বা পাদ, ৪. পায়ু এবং ৫. উপস্থ।

গ. তিনটি অন্তরেন্দ্রিয় : ১. মন, ২. বুদ্ধি এবং ৩. অহংকার।

প্রশ্ন : ২০২৫ ॥ কৈবল্যপন্থা কি?

উত্তর : ভগবদ্ উপলব্ধির একমাত্র পন্থা বলে ভক্তিযোগকে বলা হয় কৈবল্য। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী বেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—একে নারায়নো দেবঃ পরাবরানাং পরমান্তে কৈবল্য সংজ্ঞিতঃ এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রী নারায়ণ কৈবল্য নামে পরিচিত। যে উপায়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায় তাকে বলে কৈবল্যপন্থা বা ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। এই কৈবল্য পন্থার শুরু হয় পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ থেকে এবং এই প্রকার হরিকথা শ্রবণের ফলে স্বাভাবিকভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়। এই অবস্থায় জড় বিষয়ের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না।

প্রশ্ন : ২০২৬ ॥ ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রধান গুণাবলীসমূহ কি কি?

উত্তর : ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী আপনা থেকেই বিকশিত হয়। সেই সমস্ত গুণাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হল : তিনি দয়ালু, শান্ত, সত্যবাদী, সমদর্শী, ত্রুটিহীন, উদার, মৃদু, শচী, অনাসক্ত, শুভাকাঙ্খী, সন্তুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত, লালসা রহিত, সরল, স্থির, সংযত, মিতভুক, প্রকৃতিস্থ, শিষ্ট, নিরহঙ্কার, গম্ভীর, মৈত্রীভাবাপন্ন, কবি, দক্ষ এবং মৌন।

প্রশ্ন : ২০২৭ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতকে পরমহংস সংহিতা বলা হয় কেন?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত হল সর্বোচ্চ স্তরের মহাত্মাদের জন্য বৈদিক শাস্ত্র। এতে পরম জ্ঞান বা সর্বোচ্চস্তরের পারমার্থিক জ্ঞান বর্ণিত

হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা হলেন পরমহংস বা সর্বোচ্চ স্তরের মহাত্মা। এই কারণে শ্রীমদ্ ভাগবতকে পরম-হংস সংহিতা বলা হয়।

প্রশ্ন : ২০২৮ ॥ নিত্য সিদ্ধ এবং সাধন সিদ্ধ কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : শৈশব থেকেই যাঁরা মহান ভগবদ্ ভক্ত—এমন সব মহাভাগবতদেরকে বলা হয় নিত্যসিদ্ধ বা জন্ম থেকেই মুক্ত-আত্মা। যেমন মহারাজ প্রহ্লাদ এবং পরীক্ষিৎ। কিন্তু অন্য অনেকে রয়েছেন যাঁরা জন্ম থেকে মুক্ত পুরুষ নন। কিন্তু সঙ্গ প্রভাবে ভগবদ্ ভক্তির পথে অগ্রসর হন। তাঁদের বলা হয় সাধন-সিদ্ধ। কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সকলেই সাধন-সিদ্ধ ভক্ত হতে পারেন। অবশ্য চরমে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন : ২০২৯ ॥ গৃহস্থ ভক্তদের কি ধরনের অর্চাবিগ্রহ পুঁজা করা উচিত?

উত্তর : প্রত্যেক গৃহীর কর্তব্য হল শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা সীতা-রাম, অথবা নৃসিংহ, বরাহ, গৌর-নিতাই, মৎস, কুর্ম, শাল গ্রাম বা বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, কেশব, অচ্যুত, বাসুদেব, নারায়ণ, দামোদর বা বৈষ্ণবতন্ত্রে বর্ণিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠাসহকারে অর্চন-বিধি পালনপূর্বক সেই বিগ্রহের পুজা করা। তবে এদের মধ্যে গৌর-নিতাই বিগ্রহের সেবাই অধিকতর সহজ বলা যায়।

প্রশ্ন : ২০৩০ ॥ নাম অপরাধ হচ্ছে বুঝার লক্ষণ বা উপায় কি?

উত্তর : ভগবদ্ ভক্তির অনুশীলনে শ্রবণ এবং কীর্তন হল সবচেয়ে মুখ্য অঙ্গ এবং তা যদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণ সমন্বিত অপ্রাকৃত আনন্দের উপলব্ধি হবে। এইসব হল ভগবৎ প্রেমের পূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ার ভাবস্তরের প্রাথমিক লক্ষণ যা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়। ভগবানের দিব্য নাম নিরন্তর শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলেও যদি এই ধরনের প্রতিক্রিয়া না হয় তবে বুঝতে হবে নাম অপরাধ আছে। কারণ ভগবানের নাম গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায়

দশটি অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ভক্ত যদি বিশেষভাবে সতর্ক না হন, তাহলে অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণের মাধ্যমে ভগবৎ-বিরহের প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না।

প্রশ্ন : ২০৩১ ॥ ভগবৎ প্রেমের ভাবস্তরের লক্ষণগুলি কি কি?

উত্তর : ভগবৎ প্রেমের ভাবস্তরের প্রকাশ হয় আটটি অপ্রাকৃত লক্ষণের মাধ্যমে। যথা—জাড্য, স্বেদ, পুলক, গদগদ্, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং সবশেষে সমাধি। শ্রীল রূপ গোস্বামীর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** পুস্তকে এসব অপ্রাকৃত লক্ষণ এবং স্থায়ী ও সঞ্চারীভাবের বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন : ২০৩২ ॥ ভগবদ্ ভক্ত কি ভগবানের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারেন?

উত্তর : বিশেষ অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে ভগবান তার ভক্তকে মর্যাদাদানের লক্ষ্যে তাঁর চেয়েও অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন করে উপস্থাপন করতে পারেন। কেবলমাত্র ভগবানের বিশেষ কৃপায় বিশেষ অবস্থায় ভগবানের শক্তিশালী ভক্ত ভগবানের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন। যেমন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সাগর অতিক্রম করে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য সেতুবন্ধন করতে হয়েছিল। কিন্তু হনুমানজী, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তাঁর নামে লাফ দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। এখানে ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি এতটাই করুণাময় হয়েছিলেন যে প্রিয় ভক্তকে তাঁর থেকেও শক্তিশালীরূপে উপস্থাপন করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি এবং ভগবদ্ ভক্ত মহারাজ অম্বরীষের কাহিনী থেকেও একই রকম বক্তব্যের সমর্থন মিলে।

প্রশ্ন : ২০৩৩ ॥ সৃষ্টিতত্ত্বে বিষ্ণুরূপে ভগবান কোথায় কোথায় অবস্থান করেন?

উত্তর : সৃষ্টিতত্ত্বে কারনোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের প্রতিটি বস্তুতে প্রবেশ করেন। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুরূপে তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেন।

প্রশ্ন : ২০৩৪ ॥ সন্ন্যাস আশ্রমের ক্রমোন্নতির স্তরগুলি কি কি?

উত্তর : পারমার্থিক জীবনের সন্ন্যাস আশ্রমে মানুষের ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতির স্তর রয়েছে। সন্ন্যাস আশ্রমের সেই ক্রমোন্নতির স্তরগুলো হল : কুটীচক, বহুদক, পরিব্রাজক এবং পরমহংস।

প্রশ্ন : ২০৩৫ ॥ পরমহংস কতপ্রকার এবং কি কি?

উত্তর : শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে দুই প্রকার পরমহংস রয়েছেন—ব্রহ্মানন্দী (নির্বিশেষবাদী) এবং প্রেমানন্দী (শুদ্ধ ভগবদ্ ভক্ত)। ব্রহ্মানন্দী এবং প্রেমানন্দী উভয়ই পরমার্থবাদী এবং জড়জগতের দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ নিকৃষ্ট জড়া প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। প্রেমানন্দীরা অবশ্য ব্রহ্মানন্দীদের থেকে অধিক ভাগ্যবান। কারণ তারা ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। ব্রহ্মানন্দীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের পন্থা অবলম্বন করেন। ভগবান যেহেতু করুণাময় তাই ব্রহ্মানন্দীরাও তাঁদের এই বাঞ্চিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন : ২০৩৬ ॥ ভগবদ্ ভক্তির অনুশীলনে সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ কি?

উত্তর : ভগবদ্ ভক্তি অনুশীলনের বলে বা শক্তিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে পাপ করার মনোভাবকে বলা হয় **নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপ বুদ্ধিঃ**—অর্থাৎ নাম বলে পাপ আচরণ করা। ভগবদ্ ভক্তির অনুশীলনে এই হল সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ।

প্রশ্ন : ২০৩৭ ॥ ব্রহ্মগতি কি?

উত্তর : যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফুর্ত প্রেমবশত সেবা সম্পাদন করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। যিনি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এই পন্থা অবলম্বন করেন এবং জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। মানব জীবনের এই সিদ্ধিকেই বলা হয় ব্রহ্মগতি। বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে **শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী** বলেছেন ব্রহ্মগতির অর্থ হল ভগবানের মতো চিন্ময়রূপ প্রাপ্ত হওয়া এবং

সেইরূপে মুক্তজীব চিদাকাশের কোন চিন্ময় ধামে নিত্যজীবন লাভ করেন। সিদ্ধিলাভের কোন কঠোর পন্থা অনুশীলন না করেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে জীবনের এই পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

প্রশ্ন : ২০৩৮ ॥ শ্রীবিগ্রহ, গুরু, বৈষ্ণব এবং নাম সম্পর্কে বৈষ্ণব নির্দেশনা কি কি?

উত্তর : মন্দিরে পুজিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মূর্তি বলে মনে করা উচিত নয়। সদ্‌গুরুকে সাধারণ মানুষ বলে গণ্য করা উচিত নয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কোন বিশেষ জাতির অর্ন্তভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয় এবং ভগবানের দিব্য নামকে সাধারণ শব্দ বলে মনে করা উচিত নয় (পদ্ম পুরাণ)।

প্রশ্ন : ২০৩৯ ॥ ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী এবং ভগবদ্ ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : যারা আত্ম উপলব্ধির পথ অবলম্বন করেছেন তাঁদেরকে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভগবদ্‌ভক্ত এই চার স্তরে ভাগ করা হয়। যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত তাদেরকে বলা হয় কর্মী বা ভুক্তিকামী—অর্থাৎ যারা জড় সুখভোগে আকাংখী। মনের দ্বারা যারা ভগবানকে জানতে যায় তাদেরকে বলা হয় জ্ঞানী বা মুক্তিকামী। এরা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্খী। যারা অনিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, ঈশ্বত্ব, বশিত্ব ইত্যাদি আট প্রকার জড়-সিদ্ধি লাভের জন্য বিভিন্ন ধরনের তপস্যা করে তাদেরকে বলা হয় যোগী বা সিদ্ধিকামী। চরমে তারা সমাধিস্থ অবস্থায় পরমাত্মাকে দর্শন করে। আর যাঁরা নিজেদের আত্ম তৃপ্তির জন্য কোন আকাঙ্খা না করে শুধুমাত্র ভগবদ্ সেবায় আগ্রহী বা নিয়োজিত তারাই ভগবদ্ ভক্ত।

ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী এবং সিদ্ধিকামীরা তাদের ব্যক্তিগত সুখের বাসনা করে। কিন্তু নিষ্কাম ভগবদ্ ভক্ত কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনের বাসনা করেন। তাঁরা ভগবানের আদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং সর্বদাই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিজ নিজ কর্তব্য সাধনে প্রস্তুত থাকেন।

প্রশ্ন : ২০৪০ ॥ বেদকে কোন্ অর্থে অপৌরুষেয় বলা হয়?

উত্তর : ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞানের প্রবক্তা হলেও প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানই তাঁকে এই দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। অর্থাৎ এই জ্ঞান সরাসরিভাবে ভগবান থেকেই অবতীর্ণ হয়েছেন। বেদকে তাই বলা হয় অপৌরুষেয়—অর্থাৎ কোন সৃষ্ট জীব থেকে এর উদ্ভব হয় নাই।

প্রশ্ন : ২০৪১ ॥ ব্রহ্মার এক নাম বেদগর্ভ—কেন?

উত্তর : গর্ভোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। জন্মের পরপরই ভগবান তাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার করেন। ফলে জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন বেদান্ত তত্ত্ববেত্তা। তাই তিনি বেদগর্ভ নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন : ২০৪২ ॥ ধ্যানের কয়টি পদ্ধতি রয়েছে?

উত্তর : ধ্যানের মূলতঃ দুইটি পদ্ধতি আছে : অষ্টাঙ্গযোগ এবং সাংখ্যযোগ। অষ্টাঙ্গযোগ ধ্যান হল ধারণ, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার অভ্যাস। আর সাংখ্যযোগের লক্ষ্য হল সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। তবে মনে রাখা দরকার যে চরমে উভয় পদ্ধতির লক্ষ্য হল নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি যা পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক অভিব্যক্তিমাত্র।

প্রশ্ন : ২০৪৩ ॥ ভগবান সর্বজীবের অভ্যন্তরে বিরাজ করা সত্ত্বেও সবার আচরণ একইরকম হয় না কেন।

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানকে সর্বভূত অন্তরাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে—অর্থাৎ তিনি সবার শরীরের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন। তবে যারা তাঁর শরণাগত তাদেরকে তিনি পরিচালনা করেন। যারা তাঁর শরণাগত নয় তাদেরকে জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তাদেরকে ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম করতে দেওয়া হয় এবং এর ফলে তারা জড়জাগতিক ফলাফল ভোগ করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন : ২০৪৪ ॥ পরমেশ্বর ভগবান কি নির্বিশেষ রূপ থেকে জড়রূপ ধারণ বা পরিগ্রহ করেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানরহিত, আত্মকেন্দ্রিক নির্বিশেষবাদীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পরমেশ্বর ভগবান কোন বিশেষ

কাজ সম্পাদনের জন্য তাঁর স্বরূপজগত নির্বিশেষ চিন্ময়রূপ থেকে জড়রূপ পরিগ্রহ বা ধারণ করেন। কিন্তু ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ সম্পর্কে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মিশ্রণ থেকে দৃষ্ট অজ্ঞানতারই প্রকাশ। ভগবান যদি তাঁর নির্বিশেষ রূপ থেকে জড় রূপ ধারণ করতেন তাহলে অর্থ হতো যে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি নির্বিশেষ থেকে সবিশেষে রূপান্তরিত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিঁনি অপরিবর্তনীয় এবং বদ্ধ জীবদের মতো কখনো জন্মগ্রহণ করেন না, নিজের ইচ্ছায় তিঁনি বিশেষ প্রয়োজনে আবির্ভূত হন মাত্র।

প্রশ্ন : ২০৪৫ ॥ ভগবানের এক নাম হৃষীকেশ। এর অর্থ কি?

উত্তর : হৃষীক্ শব্দের অর্থ হল ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ঈশ মানে হল ঈশ্বর। পরমেশ্বর ভগবান অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহেরও অধীশ্বর। তাই তাকে হৃষীকেশও বলা হয়।

প্রশ্ন : ২০৪৬ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবন কি কি?

উত্তর : ব্রহ্মাণ্ডের চৌদ্দটি ভুবন রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি হল উর্ধ্বলোক এবং সাতটি অধঃলোক। সাতটি উর্ধ্বলোক হল : সত্যলোক, তপঃলোক, জনলোক, মর্হলোক, স্বর্গলোক, ভুবলোক এবং ভুলোক। বাকী সাতটি অধঃলোক হচ্ছে : অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। এইসব লোক ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যার বিস্তার হচ্ছে দুই হাজার কোটি গুণ দুই হাজার কোটি বর্গমাইল।

প্রশ্ন : ২০৪৭ ॥ এককথায় শুদ্ধ ভগবদ্ ভক্তি কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতিকে বলা হয় শুদ্ধ ভগবদ্ ভক্তি।

প্রশ্ন : ২০৪৮ ॥ ভগবান যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিশেষ—এর মানে কি?

উত্তর : ভগবানের প্রকৃত বর্ণনা হল তিনি একাধারে সবিশেষ এবং নির্বিশেষ। তাঁর সবিশেষ রূপই প্রকৃত রূপ। নির্বিশেষ প্রকাশ তাঁর দিব্য শরীরের প্রতিবিম্ব মাত্র। যাঁরা ভগবানকে সামনা-সামনি দর্শনের

সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁর সবিশেষ রূপ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের অজ্ঞানপক্ষে রয়েছে—অর্থাৎ যারা পশ্চাৎদেশ থেকে ভগবানকে দর্শন করে তারা তাঁর নির্বিশেষ রূপ দর্শন করে।

প্রশ্ন : ২০৪৯ ॥ ব্রহ্মার আয়ু কি জড়জাগতিক সময় দ্বারা নির্ণয় করা যায়? (ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল কত সৌরবছর?)

উত্তর : মানুষের—অর্থাৎ সৌরজগতের গণনা অনুযায়ী ব্রহ্মার একদিন একসহস্র চর্তুযুগ। এক চর্তুযুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযোগ) হল ৪৩,২০,০০০ সৌর বছর। তাহলে ব্রহ্মার একদিন (দিবাভাগ) হবে ৪৩,২০,০০০ × ১০০০ = ৪৩,২০,০০০০০০ বছর। আবার একরাত্রিও ৪৩২,০০০০০০০ বছর। সুতরাং ব্রহ্মার একদিন-একরাত্রি হল ৮৬৪,০০০০০০০ বছর। ব্রহ্মার আয়ু ব্রহ্মলোকের একশত বছর। তাই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল সৌর গণনা অনুযায়ী ৮৬৪,০০০০০০০ × ৩৬৫ × ১০০ বছর হবে।

প্রশ্ন : ২০৫০ ॥ ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রথম চার কুমারের নাম কি কি?

উত্তর : ভগবানের সৃষ্ট প্রথম জীব হিসাবে ব্রহ্মা তাঁর দেহ থেকে চারজন কুমার সৃষ্টি করেন। তাঁদের নাম হল সনক, সনাতন, সনৎ কুমার এবং সনন্দন।

প্রশ্ন : ২০৫১ ॥ এককথায় ভগবানের মুখ্য রূপ কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য রূপ হল দ্বিভুজ মুরলীবাদক শ্যাম সুন্দর রূপ।

প্রশ্ন : ২০৫২ ॥ চিৎ এবং জড়-জগতে ভগবান তাঁর কত ভাগ প্রকাশ করেন?

উত্তর : ভগবানের প্রকাশের শতকরা পচাত্তর ভাগ (ত্রিপাদ-বিভুতি) চিদাকাশে প্রকাশিত হয়। বাকী শতকরা পঁচিশভাগ সমগ্র জড়-জগতকে প্রকাশিত করে। এইভাবে ভগবানের প্রকাশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বিস্তার হল তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি, আর শতকরা পঁচিশ ভাগ বিস্তারকে বলা হয় তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি।

প্রশ্ন : ২০৫৩ ॥ মুক্ত এবং বদ্ধজীব ভগবানের কোন্ কোন্ শক্তিতে অবস্থান করে?

উত্তর : মুক্তজীব বা মুক্ত আত্মা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করে। কারণ তাঁরা চিদাকাশে অবস্থান করতে পারেন। বদ্ধ জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করে। অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির অধীনে বসবাস করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন : ২০৫৪ ॥ মৃত্যুর পর চিদাকাশের কোন গ্রহলোকে উপনীত হতে পারলে কি লাভ?

উত্তর : চিদাকাশের গ্রহসমূহ চিন্ময় হওয়ার ফলে জড়াপ্রকৃতির গুণের অতীত। সেগুলো কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে রচিত। সেখানে চিন্ময় আনন্দ পূর্ণরূপে বর্তমান। এসব গ্রহলোকে তাই উপনীত হতে পারলে জন্ম, মৃত্যু, জড়া এবং ব্যধি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সেখানে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে সর্বদা যুক্ত করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন : ২০৫৫ ॥ অর্জুনকে প্রদর্শিত বিশ্বরূপ কি ভগবানের প্রকৃত রূপ?

উত্তর : ভগবান জড়া প্রকৃতিতে গর্ভসঞ্চার করে জড়জগতকে প্রকাশিত করে তারপর সেই প্রকাশের মধ্যে বিশ্বরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। অর্জুনকে তিনি যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তা ভগবানের প্রকৃত রূপ নয়। ভগবানের প্রকৃত রূপ হল চিন্ময় পুরুষোত্তম বা স্বয়ং কৃষ্ণরূপ (দ্বিভুজ মুরলীরূপ)।

প্রশ্ন : ২০৫৬ ॥ ভগবানের ত্রিশক্তি কি কি এবং এগুলো কি কি দ্বারা প্রদর্শিত হয়?

উত্তর : ভগবানের প্রধান তিনটি শক্তি হল : অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তি সত্ব, রজঃ এবং তমো—এই তিনটি গুণ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। তাঁর অন্তরঙ্গাশক্তি সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী—এই তিনটি চিন্ময় গুণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। তটস্থা শক্তি বা জীব শক্তিও চিন্ময় যা ভগবানের পরা-প্রকৃতি সম্ভূত।

প্রশ্ন : ২০৫৭ ॥ বরাহরূপী ভগবান হিরন্যাক্ষ দৈত্যকে কিভাবে নিহত করেন?

উত্তর : পুরাকালে হিরন্যাক্ষ দৈত্যের আসুরিক কার্যক্রমের ফলে পৃথিবী তার ভারসাম্য হারিয়ে গর্ভোদক সমুদ্রে পতিত হয়েছিল। বরাহরূপী ভগবান যখন পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন তখন হিরণ্যাক্ষ তাঁর সেই কাজে বাধাদানের চেষ্টা করে। তখন ভগবান তাঁর দন্তদ্বারা বিদীর্ন করে তাকে সংহার করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর মতে হিরন্যাক্ষ দৈত্য ভগবানের হস্ত দ্বারা নিহত হয়েছিল। তাঁর মতে হস্তের দ্বারা নিহত করার পর ভগবান সেই দৈত্যকে তাঁর দন্তের দ্বারা বিদীর্ন করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই মতবাদ সমর্থন করেছেন।

প্রশ্ন : ২০৫৮ ॥ কি কারণে পুরাকালে পৃথিবী সমুদ্রগর্ভে নিমর্জ্জিত হয়েছিল?

উত্তর : সৃষ্টির শুরু থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহে অসুর এবং দেবতা এই দুই শ্রেণীর জীব দেখা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হলেন প্রথম দেবতা এবং হিরন্যাক্ষ হল প্রথম অসুর। কিছু বিশেষ অবস্থায়ই কেবলমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহগুলি ভারহীন গোলকের মতো মহাশূন্যে ভেসে থাকে। যখন ঐ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তখন যে কোন গ্রহ গর্ভোদক সমুদ্রে পতিত হতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ গর্ভোদক সমুদ্রে পূর্ণ এবং বাকী অর্ধাংশ একটি গম্বুজের মতো যেখানে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজ করে। শূন্যে গ্রহগুলির ভারহীন অবস্থায় ভাসার ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের অভ্যন্তরীন অবস্থার উপর। পুরাকালে হিরন্যাক্ষ প্রমুখ দৈত্যরা নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থের জন্য বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীর ভারসাম্য বিনষ্ট করে দেয়। তার ফলে পৃথিবী একসময় গর্ভোদক সমুদ্রে পতিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : ২০৫৯ ॥ ভগবানের বাৎসল্যভাবের কতিপয় উদাহরণ দিন।

উত্তর : ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে বাৎসল্যভাবের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

১. নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মাতার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ।
২. প্রজাপতি কর্দম এবং তাঁর পত্নী দেবাহূতির পুত্ররূপে ভগবান শ্রী কপিলদেব।
৩. মহারাজ নাভি এবং সুদেবীর পুত্ররূপে ভগবান ঋষভদেব নামে পরিচিত।
৪. অত্রি ঋষির পুত্ররূপে ভগবান দত্তাত্রেয় রূপে। অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করলাম।" তার ফলে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হয়েছিল।
৫. ভগবান পৃথু অবতারে মহারাজ বেন-এর পুত্রত্ব স্বীকার করেন।

প্রশ্ন : ২০৬০ ॥ ভগবানের জ্ঞানাবতার কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বিভিন্ন লোক সৃষ্টির বাসনায় তপস্যায় নিমগ্ন হন। তখন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান চতুঃসনরূপে (সনক, সনৎ কুমার, সনন্দন এবং সনাতন) ব্রহ্মার পুত্র হিসাবে আবির্ভূত হন। এই চতুঃসন হলেন ভগবানের জ্ঞানাবতার। তাঁরা এমন স্পষ্টভাবে দিব্যজ্ঞান বিশ্লেষণ করেছিলেন যে সমস্ত ঋষিরা তৎক্ষণাৎ তা অনায়াসে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ২০৬১ ॥ ভগবান পৃশ্নিগর্ভ নামক চতুর্ভুজরূপে কখন অবতরণ করেছিলেন?

উত্তর : মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ভগবানের এক মহান ভক্ত রাজপুত্র ধ্রুব তাঁর গুরুদেব শ্রী নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে একসময় অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেন। নারদ মুনি ধ্রুবকে **"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"** মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তখন ভগবান বাসুদেব পৃশ্নিগর্ভ নামক চতুর্ভুজরূপে অবতরণ করে ধ্রুবকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে এক বিশেষ গ্রহলোক প্রদান করেছিলেন যা ধ্রুবলোক নামে পরিচিত।

প্রশ্ন : ২০৬২ ॥ ব্রহ্মার জীবনকালে কতজন মনুর আবির্ভাব হবে?

উত্তর : ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়। ত্রিশদিনে মাস ধরলে এইভাবে ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ জন মনু এবং একবছরে ৫০৪০ জন (৪২০ × ১২ = ৫০৪০) মনুর আবির্ভাব হবে। ব্রহ্ম লোকের সময় অনুযায়ী ব্রহ্মার আয়ু একশত বছর। ফলে ব্রহ্মার জীবনকালে ৫০৪,০০০ জন মনু আসবেন বলা যায়।

প্রশ্ন : ২০৬৩ ॥ কোন্ অবতারে ভগবান একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন?

উত্তর : যখন ক্ষত্রিয় নামধারী শাসকেরা পরম সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্রাহ্মণদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করে এবং ভোগবিলাসে লিপ্ত হয় তখন পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান তাঁর তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা একুশবার ক্ষত্রিয়দের বিনাশ সাধন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ২০৬৪ ॥ ভগবানের বুদ্ধ অবতার কি আধুনিক ইতিহাসে বর্ণিত বুদ্ধ অবতার?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (২/৭/৩৭) উল্লেখিত ভগবান বুদ্ধ আধুনিক ইতিহাসের বর্ণিত বুদ্ধ নন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর মতে এই শ্লোকে যে বুদ্ধ অবতারের কথা বলা হয়েছে তিনি অন্য এক কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক মনুর জীবনকালে ৭১ এর অধিক কলিযুগ হয়। এদেরই কোন এক বিশেষ কলিযুগে ভাগবতে উল্লেখিত ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। মানুষ যখন অত্যন্ত জড়বাদী হয়ে উঠে এবং সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্ম-নীতির প্রচার করে তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী তিনি উপধর্ম প্রচার করেন।

প্রশ্ন : ২০৬৫ ॥ ভগবান ত্রিবিক্রম নামেও পরিচিত কেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান ত্রিবিক্রম নামেও পরিচিত। কেননা এক সময় তাঁর বামন অবতারে তিনি সত্যলোকেরও ঊর্ধ্বে জড়জগতের আবরণ নামক প্রকৃতির তিনগুণের সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদ বিক্ষেপ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ২০৬৬ ॥ জড় ইন্দ্রিয় এবং চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : জড় ইন্দ্রিয়সমূহ (স্থুল/দৈহিক ইন্দ্রিয়সমূহ) জড়াপ্রকৃতির অবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত। জড়জগতে ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যবহার করা হয় নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য। কিন্তু চিৎজগতে জীব পৌঁছার পর তার সুক্ষ্মদেহের ইন্দ্রিয়গুলিও চিন্ময় হয়ে যায়। তখন এগুলো শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় বা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার হয়।

প্রশ্ন : ২০৬৭ ॥ এই দুঃখময় জড়জগৎ সৃষ্টির জন্য ভগবানকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি?

উত্তর : এই দুঃখময় জড়জগৎ সৃষ্টির জন্য ভগবানকে দোষ দেয়া যায় না। যেমন কারাগার সৃষ্টির জন্য সরকারকে দোষী বানানো যায় না। কারণ অবাধ্য এবং অসংযত এবং পাপপরায়ন নাগরিকদের শাস্তি বিধানের জন্য কারাগারের প্রয়োজন রয়েছে। তেমনি যারা পরমেশ্বর ভগবানের বিধিবিধান না মেনে তাঁকে অস্বীকার করতে চায় তার বিকৃতভাব সংশোধনের জন্য ভগবান এই দুঃখময় অনিত্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বদাই চান যে অধঃপতিত জীবেরা যেন তাঁর ধামে ফিরে আসে। সেজন্য প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে, তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং তিনি স্বয়ং অবতরণ করে বদ্ধজীবদের তাঁর কাছে ফিরে যাবার সুযোগ করে দেন। যেহেতু এই জড়জগতের প্রতি তাঁর কোনরকম আসক্তি নেই তাই এই জগৎ সৃষ্টির জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

প্রশ্ন : ২০৬৮ ॥ জড়দেহের বিনাশের পর কি কোন শরীর থাকে যার দ্বারা ভগবানের সঙ্গ লাভ করা সম্ভব?

উত্তর : সাধারণ লোকেরা মনে করে যে জড়দেহের বিনাশ হলে আর কোন শরীর থাকে না। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী এই ধারণা ভুল। জীব (আত্মা) অজ। এমন নয় যে জড়দেহের উৎপত্তির ফলে জীব সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে জড়দেহের বিকাশ হয় জীবের কামনা-বাসনা অনুসারে। জড়দেহের বিবর্তনও একই কারণে হয়। তাই চিন্ময় আত্মার জীবনশক্তি থেকেই জড়দেহের প্রকাশ হয়।

জীব (আত্মা) যেহেতু নিত্য, তাই সে বায়ুর মতো দেহের ভিতর বিদ্যমান থাকে। বায়ু দেহের ভিতরে এবং বাইরে বর্তমান। তাই যখন বাইরের আবরণ জড়দেহ বিনষ্ট হয়, তখন চিৎস্ফুলিঙ্গ দেহের ভিতরের বায়ুর মতো বর্তমান থাকে। আর ভগবানের পরিচালনায় মুক্ত জীব (আত্মা) তখন ভগবানের সাথে সঙ্গ করার উপযুক্ত সারূপ্য, সালোক্য, সাষ্টি বা সামীপ্য মুক্তি লাভের অনুরূপ দেহ লাভ করে।

প্রশ্ন : ২০৬৯ ॥ পরা-ভক্তি কি?

উত্তর : সত্ত্বগুন সম্পন্ন বিভিন্ন কার্যকলাপ হল ভক্তিযুক্ত পুণ্যকর্ম, ভক্তিযুক্ত জ্ঞানের অনুশীলন, ভক্তিযুক্ত যোগ এবং চরমে গুণাতীত শুদ্ধ ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তি জড়া প্রকৃতির অতীত। একেই বলা হয় পরা-ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত ধামে উপনীত হওয়া যায়।

প্রশ্ন : ২০৭০ ॥ জীব কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : জীব দুই প্রকার : নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধ জীবেরা আবার দুই প্রকার : অনুগত এবং পাষণ্ড। অনুগতরাও আবার দুই প্রকার : জ্ঞানী ভক্ত এবং মনোধর্মী জ্ঞানী। মনোধর্মী জ্ঞানীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায় অথবা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। কিন্তু জ্ঞানী ভক্তরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়। যেসব ভক্ত পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হতে পারে নাই তারা এবং জ্ঞানী দার্শনিকেরা পরবর্তী সৃষ্টিতে পুণরায় বদ্ধ অবস্থা লাভ করে, যাতে তারা শুদ্ধ হতে পারে। এই প্রকার বদ্ধ জীবেরা ক্রমশঃ ভগবদ্ ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রগতি লাভ করে একসময় মুক্ত হয়।

প্রশ্ন : ২০৭১ ॥ জীব (আত্মা) জড়দেহ এবং মন থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও জড়জগতের বন্ধনে কিভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে?

উত্তর : চিন্ময় আত্মা (জীব) জড় পদার্থ (জড় দেহ) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সে আত্ম-মায়া নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় বিষয়ে মগ্ন হয়ে পড়ে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি তাঁর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জীব ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই জীব যদিও তার শুদ্ধ অবস্থায় শুদ্ধচেতনাময়, তথাপি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে ভগবানের ইচ্ছার অধীন।

প্রশ্ন : ২০৭২ ॥ জীব নানারূপ বিশিষ্ট হয়ে প্রকশিত হয় কেন?

উত্তর : জীবের বিভিন্ন রূপ ভগবানের মোহময়ী বহিরঙ্গা শক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের মতো, যা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জীবের ভোগ করার বাসনা অনুসারে প্রদান করেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই জড়জগতেও জীবের স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়ন করার সুযোগ রয়েছে এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন রকমের জড় দেহ বা শরীর প্রদান করে।

প্রশ্ন : ২০৭৩ ॥ "আমি" এবং "আমার" এই ধারণা দুটি কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবল?

উত্তর : "আমি" এবং "আমার" প্রকৃতপক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়। নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে "আমার" ধারণাটি প্রবল এবং উচ্চ স্তরের মানুষের ভিতর "আমি" এই ভ্রান্ত ধারণাটি প্রবল। যেমন নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে এটি আমার দেহ, এটি আমার গৃহ, এটি আমার পরিবার, এই আমার জাতি, এই আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার প্রাধান্য দেখা যায়। আর উচ্চস্তরের মনোধর্মী জ্ঞানীরা আমি অথবা আমিই সবকিছু ইত্যাদি ধারণায় ভোগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি-কে তারা তা উপলব্ধি করতে বা জানতে আগ্রহী হয় না। এই দুই শ্রেণীর লোক মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অযোগ্য।

প্রশ্ন : ২০৭৪ ॥ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মা সর্বপ্রথম কোন্ দুটি অক্ষর শুনতে পেয়েছিলেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হওয়ার পর ব্রহ্মা দুটি অক্ষর দুইবার উচ্চারিত হতে শুনতে পেয়েছিলেন। সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের ষোড়শ অক্ষর (অর্থাৎ ত) এবং দ্বিতীয় বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের একবিংশ (অর্থাৎ প) অক্ষর। অর্থাৎ তিঁনি তপ শব্দ শুনতে পান। এই তপ বা তপস্যা দ্বারাই কেবল আত্ম উপলব্ধি করা সম্ভব। এই তপ বা

তপস্যা তাই সৃষ্টির আদি থেকেই শুরু হয়েছিল বলা যায়। তাই ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রথমেই এই তপস্যার পথ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ২০৭৫ ॥ জড়জগৎ এবং চিৎজগতের মধ্যবর্তী স্থানে কি রয়েছে?

উত্তর : জড়জগৎ এবং চিৎজগতের মধ্যবর্তী বিভাজক রেখা (line of demarcation) হল বিরজা নদী। এই নদী ভগবানের শরীরের স্বেদবারি (ঘাম) থেকে উদ্ভুত। এই বিরজার পরপারেই চিৎজগৎ যা ভগবানের সৃষ্টির $\frac{৩}{৪}$ অংশ। এভাবে জড়জগৎ হল ভগবৎ সৃষ্টির ১/৪ অংশ মাত্র।

প্রশ্ন : ২০৭৬ ॥ বৈকুন্ঠবাসীরা দেখতে কিরূপ?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে বৈকুন্ঠবাসীরা সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁদের দেহ নরম পদ্মফুলের মতো, বসন পীতবর্ণ, অঙ্গ অতি কমনীয় এবং সুকুমার। তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যন্ত প্রভাবশালী, মনিখচিত পাদুকাভরনে সমলংকৃত এবং তেজী। তাঁদের কারো অঙ্গকান্তি প্রবাল, বৈদুর্য ও মৃনালের মতো এবং তাঁরা অতি দীপ্তিমান কুণ্ডল, মুকুট ও মাল্যসমূহে বিভূষিত।

প্রশ্ন : ২০৭৭ ॥ বৈকুণ্ঠ লোকের প্রধান দ্বার কয়টি এবং প্রধান দ্বাররক্ষক কে কে?

উত্তর : বৈকুণ্ঠ লোকের প্রধান দ্বার তিনটি—প্রথম, মধ্য এবং শেষ দ্বার। চণ্ড এবং কুমুদ হলেন প্রথম দ্বাররক্ষী। মধ্যদ্বারের প্রধান দ্বারীগণ হলেন ভদ্র ও সুভদ্র এবং শেষ দ্বারে রয়েছেন জয় এবং বিজয়। উল্লেখ্য যে সেখানে কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখসহ অন্যান্য দ্বাররক্ষীগণও রয়েছেন।

প্রশ্ন : ২০৭৮ ॥ পরমহংস পন্থা কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের এটি একটি অন্যতম প্রধান পন্থা বা পথ। সর্বপ্রথমে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস করতে হবে এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানবার

চেষ্টা না করে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা এবং তারপর শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হবে। ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকে ভগবানের কথা শুনতে হবে। ভক্তের সান্নিধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত বানী শ্রবণ করতে হবে। এটিই হল পরমহংস পন্থা।

প্রশ্ন : ২০৭৯ ॥ ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের সাথে কোন্ রসে সম্পর্কিত?

উত্তর : জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই পাঁচটি অপ্রাকৃত রসের যে কোন একটির দ্বারা সম্পর্কিত। শ্রীমদ্ ভাগবত (২/৯/৩০) অনুযায়ী দেখা যায় ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সখ্য রসে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন : ২০৮০ ॥ ব্রহ্মাই কি প্রকৃতপক্ষে জীব সৃষ্টি করেন?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্ন জীবদের পূর্বকল্পে তাদের কর্ম অনুযায়ী দেহ প্রদান করার ক্ষমতা কেবল তাঁর উপর ভগবান ন্যস্ত করেছেন। ব্রহ্মা তাঁর খেয়াল-খুশীমতো বিভিন্ন স্তরের জীব সৃষ্টি করেন না। তিনি জীবদের উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর দান করার কার্য্যে নিযুক্ত।

প্রশ্ন : ২০৮১ ॥ চতুঃশ্লোকী ভাগবত কি?

উত্তর : এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হলেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি চারটি মুখ্য প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন এবং ভগবান তাঁর উত্তর দেন চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে যা চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে পরিচিত। ব্রহ্মার প্রশ্নগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১. জড় এবং চিন্ময় উভয় স্তরে ভগবানের রূপ কিরকম?
২. ভগবানের বিভিন্ন শক্তি কিভাবে ক্রিয়া করে?
৩. ভগবান কিভাবে তাঁর বিভিন্ন শক্তিতে লীলা বিলাস করেন?
৪. ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করবেন?

পরমেশ্বর ভগবান উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে যা বলেন তা শ্রীমদ্ ভাগবতের ২য় স্কন্দের নবম অধ্যায়ে ৩৩-৩৬ নং শ্লোকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১. হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম এবং তখন আমি ছাড়া অন্যকিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব (২/৯/৩৩)।
২. হে ব্রহ্মা! আমার সঙ্গে সম্পর্করহিত যদি কোন কিছু অর্থপূর্ণ বলে মনে প্রতীয়মান হয়, তাহলে তার কোন বাস্তবতা নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনো, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো (২/৯/৩৪)।
৩. হে ব্রহ্মা! জেনে রাখ যে মহাভূতসমূহ যেমন উচ্চনীচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান তেমনি আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি (২/৯/৩৫)।
৪. যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় এই বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করবে। (২/৯/৩৬)

প্রশ্ন : ২০৮২ ॥ গোস্বামী কাকে বলা হয়?

উত্তর : পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ (যৌনাবেগ) দমন করার শিক্ষালাভ করতে হয়। এই সব বেগ যিনি দমনে সমর্থ হয়েছেন তাঁকে বলা হয় গোস্বামী। গোস্বামী না হলে যথার্থ গুরু হওয়া যায় না।

প্রশ্ন : ২০৮৩ ॥ ভগবদ্ ভক্তিতে সিদ্ধি লাভের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশিত পাঁচটি প্রধান বিধি কি?

উত্তর : ভগবদ্ ভক্তি লাভের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচটি প্রধান বিধির নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এগুলো হল : ১. ভগবদ্ ভক্তের সঙ্গ, ২. ভগবানের মহিমা কীর্তন, ৩. শুদ্ধ ভক্তের মুখে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ, ৪. ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানে বাস এবং ৫. ভক্তি সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা।

প্রশ্ন : ২০৮৪ ॥ আত্মারাম স্তর কি?

উত্তর : যে স্তরে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে এবং তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোনরকম আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। এই সম্পূর্ণ প্রসন্নতার স্তর পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার আদর্শ অবস্থা। এই আত্মারাম স্থিতি, যা ভক্তির অনুশীলনের ফলে জড় ইন্দ্রিয়ের উপভোগের প্রতি পূর্ণ বিরক্তির দ্বারা প্রকট হয়, সেই স্তরে মানুষ ভগবদ্ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

প্রশ্ন : ২০৮৫ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতের দশটি লক্ষণ কি কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের (গ্রহলোক/বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড) স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ভগবদ্ তত্ত্ব জ্ঞান, ভগবদ্‌ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ২০৮৬ ॥ সৃষ্টির ষোলটি উপাদান কি কি?

উত্তর : সৃষ্টির ষোড়শ উপাদান হল : পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি (মাটি) অপ (জল), তেজ (শক্তি) মরুৎ (বাতাস/বায়ু) ব্যোম (আকাশ), রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। এদেরকে বলা হয় সর্গ—অর্থাৎ আদি সৃষ্টি যা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে হয়।

প্রশ্ন : ২০৮৭ ॥ পরমেশ্বর ভগবানের পুরুষ অবতার কতটি এবং কি কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের পুরুষ অবতার তিনটি।

১. প্রথম পুরুষাবতার হলেন কারনোদকশায়ী বিষ্ণু যার প্রতিটি রোমকুপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত।
২. দ্বিতীয় পুরুষাবতার হলেন গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু যাঁর থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়।
৩. তৃতীয় পুরুষাবতার হলেন ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুতে বিরাজ করেন।

প্রশ্ন : ২০৮৮ ॥ কিভাবে মায়াবদ্ধ জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং মৃত্যু হয়?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতার নবম অধ্যায়ের ৭-৮ নং শ্লোকে ভগবান যেকথা বলেছেন তার মধ্যেই এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর নিহিত আছে। সেখানে তিনি বলেছেন : কল্পান্তে সম্পূর্ণ সৃষ্টি, যথা জড় জগৎ এবং প্রকৃতিতে ক্লেশ প্রাপ্ত জীব আমার দিব্যদেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং নতুন কল্পের আরম্ভে আমার ইচ্ছার প্রভাবে তারা পুণরায় প্রকাশিত হয়। এভাবে এই প্রকৃতি আমার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আমার ইচ্ছার প্রভাবে তা পুনঃ পুনঃ প্রকট এবং লয় হয়।

প্রশ্ন : ২০৮৯ ॥ নির্বিশেষবাদী, যোগী এবং ভগবদ্ ভক্তের সন্তুষ্টির মধ্যে মূল পার্থক্য কি?

উত্তর : নির্বিশেষবাদী কেবল ভগবানের সর্বব্যাপী প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করেই সন্তুষ্ট। তাকে বলা হয় ব্রহ্ম-উপলব্ধি। নির্বিশেষবাদীদের থেকে শ্রেয় হলেন যোগী যারা হৃদয়ে পরমাত্মারূপ ভগবানের অংশ দর্শন করেই সন্তুষ্ট। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রেমময়ী সেবার দ্বারা বাস্তবিকভাবে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিতে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে বিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করে।

প্রশ্ন : ২০৯০ ॥ মহাকল্প, বিকল্প এবং কল্প কি?

উত্তর : কারনোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবানের সৃষ্টিকে মহাকল্প বলা হয়। মহাকল্পে ভগবান কারনোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে মহত্তত্ত্ব এবং সৃষ্টির ষোলটি তত্ত্বসহ প্রথম পুরুষাবতার রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। সৃষ্টির যন্ত্র এগারটি, উপাদান পাঁচটি এবং সেগুলো সবই মহৎ বা অহংকার থেকে জাত হয়।

ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং জড় উপাদানসমূহের বিতরণকে বলা হয় বিকল্প। আর ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁর জীবনের প্রতি দিনের সৃষ্টিকে বলা হয় কল্প। তাই ব্রহ্মার একদিনকে বলা হয় কল্প এবং এইভাবে ব্রহ্মার দিন অনুসারে ত্রিশটি কল্প রয়েছে। জড় জাগতিক গণনায় ব্রহ্মার একদিন তথা কল্প (১২ ঘণ্টা) তাই ৪৩২ কোটি বছরের সমান বলা যায়। ব্রহ্মার

আয়ুষ্কালকে বলা হয় বিকল্প। ব্রহ্মার আয়ু সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকের ১০০ বছর। জড় জাগতিক গণনা অনুসারে ব্রহ্মার একদিন ও একরাত্রি হল ৮৬৪ কোটি বছর। তাই এক বিকল্প ৮৬৪ × ৩৬৫ × ১০০ কোটি বছরের সমান হবে বলা যায়। যে মহাবিষ্ণুর এক একটি নিঃশ্বাসের ফলে এক একটি বিকল্প সম্ভব হয় তাকে বলা হয় মহাকল্প। তাই এক মহাকল্প ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের সমান। এভাবে সৃষ্টি তত্ত্বে মহাকল্প, বিকল্প এবং কল্পের এক নিয়মিত এবং ধারাবাহিক চক্র রয়েছে।

প্রশ্ন : ২০৯১ ॥ ব্রহ্মার কল্প কতটি এবং কি কি?

উত্তর : ব্রহ্মার ৩০টি কল্প রয়েছে। এগুলো হল : ১. শ্বেতকল্প, ২. নীললোহিত, ৩. বামদেব, ৪. গাথান্তর, ৫. রৌরব, ৬. প্রাণ, ৭. বৃহৎকল্প, ৮. কন্দর্প, ৯. সদ্যোথ, ১০. ঈশান, ১১. ধ্যান, ১২. সারস্বত, ১৩. উদান, ১৪. গরুড়, ১৫. কৌর্ম, ১৬. নারসিংহ, ১৭. সমাধি, ১৮. আগ্নেয়, ১৯. বিষ্ণুজ, ২০. সৌর, ২১. সোমকল্প, ২২. ভাবন, ৩. সুপুম, ২৪. বৈকুণ্ঠ, ২৫. অর্চিষ, ২৬. বলীকল্প, ২৭. বৈরাজ, ২৮. গৌরীকল্প, ২৯. মাহেশ্বর, ৩০. পৈতৃকল্প। এগুলি কেবল ব্রহ্মার দিন নির্দেশ করে।

প্রশ্ন : ২০৯২ ॥ ব্রহ্মার বর্তমান কল্পের নাম কি?

উত্তর : ব্রহ্মার বর্তমান কল্পের নাম বরাহ-কল্প বা শ্বেতবরাহ কল্প। কারণ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মার সৃষ্টির সময় ভগবান বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন। তাই এই বরাহ-কল্পকে পাদ্মকল্পও বলা হয়।

প্রশ্ন : ২০৯৩ ॥ শ্রীবলরামের আদি চতুর্ভুজ কারা?

উত্তর : শ্রীবলরামের মূল প্রকাশ আদি চতুর্ভুজ হলেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। তাঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। শ্রীরামচন্দ্রের অবতারে এঁরা সকলে বিশেষ ধরনের লীলা করার জন্য বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন মূল বাসুদেব এবং তাঁর ভাইয়েরা (লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন) হলেন সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে অনিরুদ্ধ ভগবানের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ২০৯৪ ॥ পরমেশ্বর ভগবানের লীলা (শ্রীকৃষ্ণের লীলা) আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে কতদিন পরপর হয়? ভগবানের নিরন্তর লীলা কি?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী সামগ্রিক অর্থে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন করে ব্রহ্মা রয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান নিত্যলীলায় মগ্ন থাকেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডেই তাঁর লীলার প্রকাশ ঘটে। তাই এক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব (অপ্রকট) এবং অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলা একই সময়ে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ডের লীলার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে তার প্রকাশ ঘটে। এইভাবে তাঁর নিত্যলীলা নিরন্তরভাবে হয়ে থাকে। সূর্যের উদয় যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় একবার হয় তেমনি ব্রহ্মার একদিনে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা একবার সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মার একদিনের সময়সীমা ৪৩২ কোটি বছর (ব্রহ্মার একদিন = একসহস্র চতুর্যুগ। চতুর্যুগের সময়সীমা ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছর। তাই ব্রহ্মার ১ দিন = ৪৩২০০০০ × ১০০০ = ৪৩,২,০০০,০০০০ সৌর বছর)। জড়জগত তথা এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর দিনের বেলায় ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে লিপ্ত হন এবং রাত্রিবেলায় তিঁনি যখন নিদ্রা যান তখন জড়জগত বিনষ্ট হয়। জড়সৃষ্টির সময়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার অপ্রাকৃত দেহে এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে লীলা বিলাস করেন। তাই বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি ৪৩২ কোটি বছর অন্তর শ্রীকৃষ্ণের একবার লীলার প্রকাশ ঘটে।

প্রশ্ন : ২০৯৫ ॥ দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কখন থেকে আরম্ভ হয়ে কখন শেষ হয়?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মামা মথুরার রাজা কংসের কারাগারে আবির্ভূত হন। তাই এই সময় থেকেই তার লীলা আরম্ভ হয়। আবার যদুবংশের ধ্বংসের পর তিনি অপ্রকট হন যা মহাভারতের মৌষলপর্বে বর্ণিত। তাই বলা যায় মৌষলপর্বেই তিঁনি তাঁর লীলার অবসান ঘটান।

প্রশ্ন : ২০৯৬ ॥ কেন ভগবান এই জড়জগতে লীলা বিলাস করার সময় চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হন নাই?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান যে ব্রহ্মাণ্ডেই লীলা বিলাস করেন সেখানকার সৃষ্ট জীবদের আদলেই তিঁনি তাঁর অপ্রাকৃত দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন। মর্ত লোকের জীব মানুষ দ্বিভুজ বিশিষ্ট। তাই তিঁনিও এই লোকে লীলা বিলাসের উপযুক্ত দ্বিভুজ রূপ নিয়ে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠ রূপ নিয়ে মানবসমাজে আবির্ভূত হন নাই। কারণ তাহলে সেই রূপ মর্তলোকে তার লীলার উপযোগী হতো না। তবে কখনো মনে করা উচিত নয় যে তাঁর এই রূপ বৈকুণ্ঠ স্বরূপ থেকে নিম্নমানের।

প্রশ্ন : ২০৯৭ ॥ মর্ত্যলীলায় প্রকটিত ভগবানের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দররূপ কোন অর্থে সর্বোত্তম?

উত্তর : বৈদিক জ্ঞানী শাস্ত্রবিদরা মনে করেন যে মর্ত্যলোকে প্রকটিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ সর্বোত্তম। কেননা মর্ত্যলীলায় প্রদর্শিত তাঁর করুণা বৈকুণ্ঠ লোককেও অতিক্রম করে। বৈকুণ্ঠ লোকে ভগবান কেবল ভক্ত তথা নিত্যমুক্ত জীবদের প্রতি কৃপাবান। কিন্তু মর্ত্যলোকে তিনি তাঁর ভক্ত ছাড়াও অধঃপতিত নিত্যবদ্ধ জীবদের প্রতিও কৃপা পরায়ণ। মর্ত্যলোকে যোগমায়ার প্রভাবে তিনি যে তাঁর ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শন করেন, তা বৈকুণ্ঠলোকেও বিরল। বৃন্দাবনে তাঁর রাসলীলা এবং ষোল হাজার মহিষীসহ গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের নারায়ণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

প্রশ্ন : ২০৯৮ ॥ জড়দেহ ত্যাগের পর কারা গোলোক বৃন্দাবনে এবং কারা বৈকুণ্ঠ ধামে উপনীত হবেন?

উত্তর : ভগবানের ধাম হল গোলোক বৃন্দাবন। পক্ষান্তরে যেখানে তার অংশ/স্বাংশগণ অবস্থান করেন, সেই জায়গাকে বলে বৈকুণ্ঠধাম। সেখানে ভগবান নারায়ণরূপে বিরাজমাণ। ভগবৎ প্রেম সুপ্তভাবে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে রয়েছে। ভগবদ্ ভক্তি অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল সেই সুপ্ত শ্বাশত ভগবত প্রেম জাগরিত করা। কিন্তু সেই অপ্রাকৃত প্রেম জাগরিত করার বিভিন্ন মাত্রা আছে। যাঁদের ভগবৎ প্রেম পূর্ণমাত্রায় জাগরিত

হয়েছে তাঁরা চিদাকাশে গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যান। কিন্তু যাঁদের ভগবৎ প্রেম ঘটনাচক্রে বা সঙ্গ প্রভাবে জাগরিত হয় তাঁরা বৈকুণ্ঠধামে উন্নীত হন। তবে মনে রাখা দরকার তত্ত্বতঃ গোলোক ও বৈকুণ্ঠ ধামের মধ্যে কোন ভৌতিক পার্থক্য নেই। বৈকুণ্ঠে ভগবান অসীম ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সেবিত হন, আর গোলাকে তিনি স্বাভাবিক প্রেমের দ্বারা সেবিত হন।

প্রশ্ন : ২০৯৯ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও কারা ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল?

উত্তর : যে সব যোদ্ধা অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও ভগবানের মুখকমল দর্শন করে প্রাণত্যাগ করে। কারণ ঐসময় তাঁদের হৃদয়ে সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল। এককথায় যাঁরা বন্ধু অথবা শত্রু না হয়ে তটস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং ভগবানের অপার সৌন্দর্য দর্শন করে কিছু মাত্রায়ও ভগবৎ প্রেম লাভ করেছিলেন তাঁরাই বৈকুণ্ঠধামে উন্নীত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ২১০০ ॥ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও কেন শিশুপাল বৈকুণ্ঠ লোকে যেতে পারে নি?

উত্তর : শিশুপাল ছিলেন চেদীরাজ্যের রাজা দমঘোষের পুত্র। তিনি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই ছিলেন। সবসময় কৃষ্ণ-নিন্দা করতেন। একসময় ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করায় শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তার মস্তক ছেদন করেন। এর ফলে শিশুপাল সাযুজ্য মুক্তি লাভ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যান। শিশুপালের মৃত্যুর সময়ও ভগবানের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়নি, শত্রুভাব নিয়েই শিশুপাল মৃত্যুবরণ করে। ফলে চিদাকাশের বৈকুণ্ঠধামে তিনি উন্নীত হতে পারেন নাই। শত্রুভাব নিয়ে ভগবানের হাতে মৃত্যু হলে ব্রহ্মজ্যোতিতে তার গতি হয়। কিন্তু শত্রু হলেও মৃত্যুর সময় যদি ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত অনুরাগের উদয় হয় তাহলে শত্রুকেও ভগবান তাঁর বৈকুণ্ঠ লোকে স্থান দেন।

প্রশ্ন : ২১০১ ॥ একমাত্র কার দেহ এবং আত্মা অভিন্ন?

উত্তর : একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের বেলায় এটি প্রযোজ্য, অন্যকোন জীবের বেলায় নয়, তা তিনি যত উন্নতমানেরই হন না কেন।

কারণ ভগবান হলেন সমস্ত কিছুর আঁধার। ভগবান হলেন সৎ, চিৎ এবং আনন্দের শ্বাশত বিগ্রহ। তাই তাঁর দেহ এবং আত্মা অভিন্ন।

প্রশ্ন : ২১০২ ॥ ভগবানের কোন্ স্বরূপে তার অসংখ্যরূপ মিলিত হয়?

উত্তর : ব্রহ্ম সংহিতার বর্ণনা অনুসারে ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যখন তিনি তাঁর কৃষ্ণস্বরূপে জীবদের কাছে গোচরীভূত হন, তখন এইসব অসংখ্য রূপ তাঁর মধ্যে মিলিত হন।

প্রশ্ন : ২১০৩ ॥ ভগবান নর-নারায়ণরূপে কোথায় অবস্থান করেন?

উত্তর : ভগবান বদরিকা আশ্রমে নর-নারায়ণরূপে বিরাজমান বিগ্রহ হিসাবে অবস্থান করেন। বদরিকা আশ্রম হিমালয় পর্বতের কাছাকাছি একটি স্থানে অবস্থিত। বৈদিক শাস্ত্র মতে বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্যোতি সমন্বিত চিদাকাশের গ্রহলোকের প্রতিনিধিত্ব করে যে চারটি ভগবদ্‌ধাম রয়েছে তাদের মধ্যে বদরিকা আশ্রম একটি (অপর তিনটি হল রামেশ্বর, জগন্নাথপুরী এবং দ্বারকা)।

প্রশ্ন : ২১০৪ ॥ সৃষ্টির পূর্বে ভগবান কিরূপে বিরাজমান ছিলেন?

উত্তর : সমস্ত জীবের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বে অদ্বয়রূপে বিরাজমান ছিলেন। তিনি এইভাবে বিরাজ করতে পারেন। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ। সৃষ্টির পূর্বে কারনোদকশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শঙ্কর (মহাদেব) কেউ ছিলেন না। কারণ তিনি ব্যতীত সবকিছুই তাঁর অংশমাত্র।

প্রশ্ন : ২১০৫ ॥ ভগবানের মধ্যে কিভাবে জীব এবং জড়াপ্রকৃতি অবস্থান করে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতার (৯/৭) বর্ণনা থেকে দেখা যায় ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে কালচক্রে জড়জগৎ এবং জীবের সৃষ্টি হয়। ধ্বংস এবং সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থায় সমস্ত জীব এবং জড়াপ্রকৃতি ভগবানের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

প্রশ্ন : ২১০৬ ॥ ভগবানের জড়জগৎ সৃষ্টির কারণ কি?

উত্তর : আদিতে সবকিছুর একচ্ছত্র অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন একমাত্র দ্রষ্টা। সেই সময় জড়জগৎ ছিল না। তাই তিনি তাঁর অংশ এবং বিভিন্নাংশ ব্যতীত নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতি তখন প্রকাশিত ছিল। কিন্তু বহিরঙ্গা প্রকৃতি সুপ্ত/অপ্রাকশিত অবস্থায় ছিল। ভগবান এই শেষোক্ত প্রকৃতিকে জাগরিত করে সক্রিয় করতে চেয়েছিলেন। এভাবে ভগবান দ্রষ্টা হিসাবে বহিরঙ্গা শক্তির উপর দৃষ্টিপাত করায় জড়জগৎ সৃষ্টি হয়। আর ভগবান জড়জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বিস্মৃতির গর্ভে সুপ্ত বদ্ধ জীবাত্মাদের মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য যাতে তারা ভগবদ্‌ধামে—অর্থাৎ অন্ত রঙ্গা শক্তির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

প্রশ্ন : ২১০৭ ॥ মুক্ত না হলে বদ্ধজীব আবার কি অবস্থায় থেকে যায়?

উত্তর : ভগবান বদ্ধজীবকে তার তথাকথিত সুখ আস্বাদনের জন্য জড় শরীর দান করেন। কিন্তু সে যদি তার যথার্থ চেতন (ভগবৎ ভক্তি/চেতনা) লাভ না করে—অর্থাৎ চিন্ময় জগতে প্রবেশ না করে, তাহলে ভগবান তাকে পুণরায় তাঁর মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় রেখে দেন, যে রকম সে সৃষ্টির আদিতে বা পূর্বাবস্থায় ছিল।

প্রশ্ন : ২১০৮ ॥ মহত্তত্ত্ব বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : মহত্তত্ত্ব বা শুদ্ধ চেতনার ছায়া হল সমস্ত সৃষ্টির অঙ্কুরিত হওয়ার একটি ক্ষেত্র। এটি জড়াপ্রকৃতির রজঃগুণের কিঞ্চিৎ আভাসযুক্ত শুদ্ধ সত্ত্ব। এক কথায় মহত্তত্ত্ব শুদ্ধ আত্মা এবং জড় অস্তিত্বের মধ্যবর্তী মাধ্যম। এটি চিন্ময় আত্মা এবং জড় পদার্থের মিলনস্থল যেখান থেকে জীবের অহংকারের উদ্ভব হয়। এই মহত্তত্ত্বেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজের চিন্ময় শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ বপন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ২১০৯ ॥ কালী (যাকে জগন্মাতা বলে অনেকে মনে করেন) কে? তিনিই কি জগৎ সৃষ্টির উৎস?

উত্তর : জড় সৃষ্টির উপাদান তেইশটি—মহত্তত্ত্ব, অহংকার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, বানী এবং মন। এইগুলি কালের প্রভাবে একত্রে মিলিত হয় এবং পুণরায় কালের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই কাল হচ্ছে ভগবানের শক্তি এবং তা ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রিয়া করে। এই শক্তিকে বলা হয় কালী। তিঁনি কালোবর্ণের ধ্বংসকারিণী দেবীরূপে প্রকাশিতা। তিঁনি সাধারণত জড়-জগতে তমঃগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের দ্বারা পুজিতা হন। (ভাগবত ৩/৬/২)। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে শক্তি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সংমিশ্রণের ফলে জড়াপ্রকৃতিরূপে ক্রিয়াশীল হয় তা সৃষ্টির চরম উৎস নয়। ভগবান জড় তত্ত্বসমূহে প্রবিষ্ট হয়ে কালী নামক তাঁর শক্তিকে নিয়োগ করেন। তাই কালী জড়সৃষ্টির উৎস—এই ধারণাটি শ্রীমদ্ ভাগবত অনুমোদন করে না।

প্রশ্ন : ২১১০ ॥ মানুষ কোন কোন সময় তার দুঃখ কষ্টের জন্য অদৃষ্টকে দায়ী করে। এই অদৃষ্ট আসলে কি?

উত্তর : জড়জগতে জীব তার আগের অপূর্ণ বাসনা অনুসারে বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। নির্দিষ্ট শরীর বিনাশের পর জীবাত্মা সবকিছু ভুলে যায়। কিন্তু প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে এবং পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরম করুনাময় ভগবান তাকে জাগিয়ে তার প্রাক্তন বাসনাগুলির কথা মনে করিয়ে দেন। এর ফলে জীব তার পরবর্তী জীবনে সেইভাবে কর্ম করা শুরু করে। এই অদৃশ্য পরিচালনাকেই বলা হয় অদৃষ্ট।

প্রশ্ন : ২১১১ ॥ ভগবানের বিশ্বরূপ কি তাঁর নিত্যরূপ?

উত্তর : জড়সৃষ্টির সাথে জড়িত তেইশটি উপাদান (২১০৯ নং প্রশ্নে বর্ণিত) যখন ভগবানের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়েছিল তখন ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই বিরাট রূপ বা বিশ্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ নয়। জড়সৃষ্টির উপাদানগুলি প্রকাশ করার পর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে তার প্রকাশ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিরাট রূপ বা বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরূপ প্রকাশ করেছিলেন। এমন নয় যে বিরাট রূপ শ্রীকৃষ্ণকে

প্রদর্শন করেছিলেন। তাই বিরাট রূপ চিদাকাশে ভগবানের নিত্যরূপ নয়, এটি ভগবানের একটি জড় প্রকাশ। কিন্তু এই প্রাকৃত সংসর্গ থাকা সত্ত্বেও ভগবানের বিরাট রূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ থেকে অভিন্ন।

প্রশ্ন : ২১১২ ॥ চেতনা (Conciousness) কি?

উত্তর : চেতনা জীবের অথবা আত্মার লক্ষণ। জ্ঞান-শক্তি বা চেতনারূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রকট হয়। সমগ্র চেতনা হল বিরাট রূপের চেতনা। একই চেতনা প্রত্যেক জীবের মধ্যেও প্রদর্শিত হয়। চেতনার ক্রিয়া বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়। এসব বায়ু হল প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান।

পবিত্রতার মাত্রা অনুসারে চেতনা তিন প্রকার আত্মিক বোধের স্তরে বিভক্ত—আধ্যাত্মিক অথবা দেহ ও মনকে স্বরূপ বলে মনে করা, আধিভৌতিক অথবা জড় পদার্থের মধ্যে নিজের স্বরূপ অন্বেষণ করা (আধুনিক বিজ্ঞানীরা যা করেন) এবং আধিদৈবিক অথবা ভগবানের সেবকরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা।

প্রশ্ন : ২১১৩ ॥ ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী কাদেরকে বুঝায়?

উত্তর : দেহ, মন এবং বাক্যের কার্যকলাপের দ্বারা ভগবানের দিব্য মহিমা কীর্তন করার প্রচেষ্টা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। বৈষ্ণব ধারায় সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। এই ত্রিদণ্ড—দেহ, মন এবং বাক্য ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করার প্রতিজ্ঞার প্রতীক। তাই কায়-মনোবাক্যে যে সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু ভগবানের সেবায় নিয়োজিত তাঁদেরকে ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী বলা হয়।

প্রশ্ন : ২১১৪ ॥ মানুষের জড় ইন্দ্রিয় সংযত বা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় বা পন্থা কি কি?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্রে জড় ইন্দ্রিয় সংযত করার দুইটি প্রধান পন্থা রয়েছে। একটি হল জ্ঞানের পন্থা—অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে জানার পন্থা। অন্যটি হল সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়া। তবে এই দুইটি পন্থার মধ্যে শেষোক্তটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২১১৫ ॥ ভগবদ্ ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রধান স্তর কয়টি এবং কি কি?

উত্তর : ভগবদ্ ভক্তির অনুষ্ঠানের দুইটি প্রধান স্তর রয়েছে। প্রথমটি হল প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ভগবৎ সেবার অনুশীলন করা। দ্বিতীয়টি হল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধুলিকণার সেবা করার প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি লাভ করা। প্রথম স্তরকে বলা হয় সাধন-ভক্তি—অর্থাৎ নবীন ভক্তের ভক্তিমূলক সেবা যা শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় সম্পাদন হওয়া দরকার। দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয় রাগভক্তি। এই স্তরে প্রবীন ভক্ত ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির ফলে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভগবানের বিভিন্ন সেবা সম্পাদন করেন।

প্রশ্ন : ২১১৬ ॥ প্রলয়কালে ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শয়ন করেন তখন কারা তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকেন?

উত্তর : ভগবান শ্বাসত্যাগ করলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। আবার নিঃশ্বাস গ্রহণ করলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়। প্রলয়ের (বিনষ্ট) পরও ভগবান এবং কারণ সমুদ্রের অতীত তাঁর ধাম ও সেখানকার অধিবাসী ভগবৎ পার্ষদদের লয় হয় না। তারাই প্রলয়কালে এবং প্রলয়ের পরও ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

প্রশ্ন : ২১১৭ ॥ জড় জগতের প্রলয়ের পর জীব বা আত্মা কিভাবে থাকে?

উত্তর : স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—এই তিন ভুবন যখন প্রলয়ের জলে বিলীন হয়ে যায় তখন কাল নামক শক্তির সাহায্যে ত্রিলোকের সমস্ত জীব বা আত্মা তাদের সুক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। এই প্রলয়ে স্থুল (জড়) দেহ অপ্রকট (বিনষ্ট) হয়। কিন্তু সুক্ষ্ম শরীর থাকে, ঠিক জড় সৃষ্টির জলের মতো।

প্রশ্ন : ২১১৮ ॥ বৈকুণ্ঠলোকে কোন কিছু সৃষ্টি হয় কি?

উত্তর : সাধারণতঃ যেখানে কালের প্রভাব থাকে সেখানেই কিছু সৃষ্টি হতে পারে। ভগবদ্ ধাম বৈকুণ্ঠলোকে কালের কোন প্রভাব নেই। তাই সেখানে কোন প্রকার সৃষ্টিমূলক কার্যকলাপ হয় না।

প্রশ্ন : ২১১৯ ॥ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাধর্ক্য-বিগ্রহ দেখা যায় না কেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বকারণের কারণ। তিনি আদিপুরুষ। তাই মুর্খ লোক বা কুতার্কিক প্রশ্ন করে বসতে পারে ভগবান বৃদ্ধ হয় না? এর উত্তরে বলা যায় যদিও তিনি আদিপুরুষ, তবুও তিনি পুরুষ, তবুও তিনি নবযৌবন সম্পন্ন এবং তিনি কখনো বার্ধক্যের দ্বারা প্রভাবিত হন না (ব্রহ্ম সংহিতা ৫/৩৩)।

প্রশ্ন : ২১২০ ॥ জড়জগতে ব্রহ্মাই কি আদি স্রষ্টা?

উত্তর : জড়জগতেরও আদি স্রষ্টা হলেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর মধ্যে সৃষ্টির বীজ নিহিত করেন। পরবর্তীতে ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা জড়জগৎ সৃষ্টি করেন।

প্রশ্ন : ২১২১ ॥ পরাভক্তি কি?

উত্তর : পরাভক্তি বলতে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফুর্ত প্রেম বুঝায়। এটিই হল ভগবানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তি। ভগবানের শুদ্ধভক্তের কাছ থেকে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, যশ, মহিমা ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের এই সর্বোচ্চ স্তর লাভ করা যায়।

প্রশ্ন : ২১২২ ॥ ভক্তের কাছে ভগবানের রূপ কি সুনির্দিষ্ট?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৩/৯/১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে ভক্ত ভগবানের যে রূপের আরাধনা করেন সেই রূপে ভগবান তাঁর কাছে প্রকাশিত হন। ভক্তের দাবী ভগবান পূর্ণ করেন। কেননা তিনি ভক্তের প্রেমভক্তির বশীভূত।

প্রশ্ন : ২১২৩ ॥ ভক্তের অধীন ভগবান—এই কথা দ্বারা কি বুঝায় যে তিনি ভক্তের আজ্ঞাবাহক?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ ভক্তের মনোবাঞ্ছা সবসময় পূরণ করেন। এই অর্থে তিনি ভক্তের অধীন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি ভক্তের আজ্ঞাবাহক। কারণ আজ্ঞাবাহক হলেন তিনি যিনি অন্যের

নির্দেশ পালন করেন। ভগবান ভক্তের অনুরোধ পালন করেন, নির্দেশ নয়। শুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্ত সবসময় ভগবানের আজ্ঞাবাহক হন। এজন্য তাঁর পক্ষে নির্দেশক হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন : ২১২৪ ॥ ভগবান কারণবারী সাগরে শেষনাগের শরীরে শয়ন করে নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন—এটি কি কাল্পনিক?

উত্তর : অনেক মানুষই নিজেদের ক্ষমতার.বাইরে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না। এসব মুর্খ মানুষেরা যখন শোনে যে পরমেশ্বর ভগবান প্রলয়কালে নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন তখন তারা মনে করে তা কাল্পনিক। কারণ তারা মনে করে জলের ভিতরে শুয়ে কেউ কি সুখে নিদ্রা যেতে পারে? আসলে এই ধারণা একেবারেই মুর্খতাপূর্ণ। সামান্য বুদ্ধি দিয়েও এইসব মুর্খদের উপরোক্ত ধারণা বাতিল করে দেয়া যায়। যেমন সমুদ্রের তলায় অসংখ্য জীব রয়েছে। তারা নিজেদের জড় দেহের মাধ্যমে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন সুখ উপভোগ করে। এই প্রকার নগন্য জীবেরা যদি জলের ভিতর তাদের জীবন উপভোগ করতে পারে, তবে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান কেন কুণ্ডলীকৃত শেষনাগের (অনন্ত) শীতল শরীরে শয়ন করে কারণবারি সাগরের বিশাল তরঙ্গমালার (ঢেউ) দোলন উপভোগ করতে পারবেন না?

প্রশ্ন : ২১২৫ ॥ ভগবানের অর্চ্চনবিধিতে স্বীকার করা হয় শ্রীবিগ্রহ (ভগবান) নিদ্রা যান। জড়জীব (মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি) নিদ্রা যায়। ভগবান জড়-জীব নন, বরং চিন্ময়। তাহলে তাঁর আবার নিদ্রা কি?

উত্তর : যারা পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার মনে করেন তারাই এই ধরনের অনর্থক প্রশ্ন তোলেন। তাদের তথাকথিত যুক্তি হল পরমেশ্বর ভগবান জড় নন। জড়ের যেহেতু আকার রয়েছে তাই ভগবানের আকার থাকতে পারে না—অর্থাৎ তিনি নিরাকার হবেন। আবার জড় যেহেতু নিদ্রা যায়, তাই ভগবান নিদ্রা যেতে পারেন না। এইসব চিন্তাই শ্রীমদ্ ভাগবত এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার পরিপন্থী।

শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে জড়জগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে ভগবান প্রলয় বারিতে অনন্ত শর্যায় (অনন্ত বা শেষ নাগের শর্যায়) শয়ন করে আছেন, ভগবান জলের উত্তাল তরঙ্গে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতেও নিদ্রা রয়েছে বুঝা যায়। তাই অর্চ্চনবিধি অনুযায়ী শ্রীবিগ্রহ যে নিদ্রা যেতে পারেন তা বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী সঠিক।

প্রশ্ন : ২১২৬ ॥ গোপিদের সাথে ভগবানের রাসলীলা কি স্ত্রী ও পুরুষের লৌকিক সম্পর্ক?

উত্তর : শুদ্ধ ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে অপ্রাকৃত বিনিময়ের আদর্শ উদাহরণ হল গোপীদের সঙ্গে ভগবানের রাসলীলা। গোপীরা ভগবানের সেবক রূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার। তাই ভগবানের রাসলীলাকে কখনই স্ত্রী ও পুরুষের লৌকিক সম্পর্ক বলে মনে করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে তা হচ্ছে ভগবান এবং শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে অপ্রাকৃত অনুভূতি বিনিময়ের পরম পূর্ণতা।

প্রশ্ন : ২১২৭ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মার শিক্ষা গুরু কে ছিলেন?

উত্তর : ব্রহ্মার পক্ষে বাইরের সদ্‌গুরুর সাহায্য গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। কেননা সৃষ্টির প্রথম লগ্নে ব্রহ্মাই ছিলেন এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র জীব। তবে তপস্যা ও ধ্যানের মাধ্যমে তিনি তাঁর উৎপত্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্মার অন্তরের চৈত্য গুরু বলা যায়।

প্রশ্ন : ২১২৮ ॥ বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী কলিযুগের সময়ের বিভিন্ন একক কি কি?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী কাল বা সময় হল পরমেশ্বর ভগবানের মায়ার ক্রিয়ামাত্র। এতদ্‌সত্ত্বেও সময় সম্পর্কে আধুনিক যুগের ঘড়ির ভিত্তিতে বৈদিক কাল বিভাগের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

বৈদিক সময়ের এককের নাম	আধুনিক সময়ের একক	বৈদিক সময়ের এককের নাম	আধুনিক সময়ের একক
এক ত্রুটী	৮/১৩৫০০ সেকেন্ড	এক দণ্ড	২৪ মিনিট
এক বেধ	৮/১৩৫ সেকেন্ড	এক প্রহর	৩ ঘণ্টা
এক লব	৮/৪৫ সেকেন্ড	এক দিন	১২ ঘণ্টা
এক নিমেষ	৮/১৫ সেকেন্ড	এক রাত্রি	১২ ঘণ্টা
এক ক্ষন	৮/৫ সেকেন্ড	এক পক্ষ	১৫ দিন
এক কাষ্ঠা	৮ সেকেন্ড	দুই পক্ষ	১ মাস
এক লঘু	২ মিনিট	বার মাসে	১ বছর

প্রশ্ন : ২১২৯ ॥ চারযুগের সময়সীমা কি?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্রে চারযুগের উল্লেখ রয়েছে : সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। দেবলোকের একদিন মনুষ্যলোক—অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর ৩৬০ বছরের সমান। সত্যযুগের স্থিতিকাল হল দেবলোকের ৪৮০০ বছরের সমান। ত্রেতাযুগের স্থিতিকাল দেবলোকের ৩৬০০ বছরের সমান; দ্বাপর যুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ২৪০০ বছরের সমান এবং কলিযুগের স্থিতিকাল দেবলোকের ১২০০ বছরের সমান। এই হিসাবে বিভিন্নযুগের স্থিতিকাল বা সময়সীমা হল নিম্নরূপ :

যুগের নাম	দেবলোকের বছর	সৌরবছর অনুযায়ী যুগের সময়সীমা/ স্থিতিকাল
সত্যযুগ	৪৮০০	৪৮০০ × ৩৬০ = ১৭,২৮,০০০
ত্রেতাযুগ	৩৬০০	৩৬০০ × ৩৬০ = ১২,৯৬,০০০
দ্বাপরযুগ	২৪০০	২৪০০ × ৩৬০ = ৮,৬৪,০০০
কলিযুগ	১২০০	১২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০
	মোট	৪৩,২০,০০০

প্রশ্ন : ২১৩০ ॥ ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকের একদিন (দিবাভাগ) জড়জগতের (এই বিশ্বের) কত বছরের সমান?

উত্তর : এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। এক চতুর্যুগ হল ৪৩,২০,০০০ বছরের সমান। তাই ব্রহ্মার একদিন ৪৩,২০,০০০ ×

১০০০ = ৪৩২,০০,০০,০০০ বছর—অর্থাৎ আমাদের বা মনুষ্যলোকের ৪৩২ কোটি বছরের সমান। তাঁর একরাত্রিও ৪৩২ কোটি বছরের সমান।

প্রশ্ন : ২১৩১ ॥ জড়জগত বা মনুষ্যলোকের গণনায় ব্রহ্মার জীবন কাল কত বছর?

উত্তর : ব্রহ্মলোকের সময় অনুযায়ী ব্রহ্মার আয়ু ১০০ শঁত বছর। এখন ব্রহ্মার ১ দিন ও ১ রাত্রি হল মনুষ্যলোকের ৪৩২ + ৪৩২ = ৮৬৪ কোটি বছর। ৩৬৫ দিনে এক বছর হয়। তাই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল জড়জগতের গণনা অনুযায়ী ৮৬৪ × ৩৬৫ × ১০০ কোটি বছর হবে।

প্রশ্ন : ২১৩২ ॥ ত্রিলোকে সৃষ্টি এবং প্রলয় কখন হয় (কত বছর পর পর হয়?)

উত্তর : ত্রিলোক—অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—এই তিন লোক বা ভুবনের স্রষ্টা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা তার দিবাভাগে সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করেন। তাঁর রাত্রিবেলায় এই ত্রিলোক প্রলয়ে বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মার একদিন এবং একরাত্রি প্রত্যেকে জড়জগতের ৪৩২ কোটি বছর। তাই বলা যায় ৪৩২ কোটি বছর ধরে যেমন সৃষ্টি কার্য চলতে থাকে তেমনি ৪৩২ কোটি বছর ধরে প্রলয়—অর্থাৎ জড়জগতের ধ্বংস হতে থাকে।

প্রশ্ন : ২১৩৩ ॥ মনুদেরকে মানবজাতির আদি পিতা ধরা হয়। তাহলে একজন মনুর আয়ু কতকাল?

উত্তর : বিষ্ণু পুরান অনুযায়ী এক-একজন মনুর আয়ু ৭১ চর্তুযুগ। এক চর্তুযুগ জড়জগতের হিসাব অনুযায়ী ৪৩,২০,০০০ বছর। তাই এক-একজন মনুর আয়ুষ্কাল ৪৩,২০,০০০ × ৭১ = ৩০,৬৭,২০,০০০ বছরের সমান।

প্রশ্ন : ২১৩৪ ॥ ব্রহ্মার একদিনে কতবার মানুষের আবির্ভাব হয়?

উত্তর : ব্রহ্মার একদিন হল ৪৩২,০০০০০০০ বছর। একজন মনুর আয়ুষ্কাল ৩০,৬৭,২০,০০০ বছর। তাই ব্রহ্মার একদিনে ১৪ জন মনুর আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে ১৪ বার মনুষ্যজীবের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : ২১৩৫ ॥ আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরের বিস্তার কিরূপ?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের (৩/১১/৩৯) বর্ণনা অনুযায়ী এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর ৫০ কোটি যোজন বিস্তৃত। এক যোজন হল ৮০

মাইলের সমান। তাই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরের বিস্তার হল ৫০ × ৮০ = ৪০০ কোটি মাইল।

প্রশ্ন : ২১৩৬ ॥ ব্রহ্মাকর্তৃক প্রথম সৃষ্ট জীব কারা ছিলেন?

উত্তর : ব্রহ্মা প্রথমে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামের চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা চতুঃসন কুমার নামেও পরিচিত। জ্ঞানের চারটি তত্ত্ব সাংখ্য (জড়জাগতিক অবস্থার বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শন), যোগ (জড়জগতের বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তির পন্থা), বৈরাগ্য (পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য জড় সুখভোগ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া) এবং তপস্যা (পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় বিভিন্ন প্রকার কৃচ্ছসাধনের ব্রত)—এই চারটি তত্ত্বের দায়িত্বভার অর্পনের জন্য ব্রহ্মা তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা ভক্তির বিকাশ লাভের জন্য নিজেদের সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন যা প্রথমে কুমার সম্প্রদায় এবং পরবর্তীতে নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত হয়েছে। এরা সকলেই ভগবানের মহান ভক্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ২১৩৭ ॥ বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী ক্রোধ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : ক্রোধ হল লোভ ও কামের পরিণাম যা হল রজঃগুণের ফল। কাম এবং লোভ যখন অতৃপ্ত থাকে তখন ক্রোধের উদয় হয়। এই ক্রোধের উদয় হয় হৃদয়ে এবং তা চক্ষু, হস্ত, পদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন কোন মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন সেই ক্রোধ তার আরক্তিম চক্ষুর মাধ্যমে এবং কখনো বা মুষ্টিবদ্ধ হাত বা পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন : ২১৩৮ ॥ নারদ (মুনি) নামের তাৎপর্য কি?

উত্তর : "নার" শব্দের অর্থ পরমেশ্বর ভগবান। আর দ মানে হল যিনি দান করতে পারেন। সুতরাং সাধারণ অর্থে নারদ-নামের অর্থ হল যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে পারেন। তার অর্থ এই নয় যে ভগবান এক ধরনের সামগ্রী যা যেকোন ব্যক্তিকে দান করা যায়। প্রকৃত তাৎপর্য হল নারদ মুনি যেকোন ব্যক্তিকে সেবার বাসনা অনুসারে দাস,

সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেমিক রূপে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা দান করতে পারেন।

প্রশ্ন : ২১৩৯ ॥ বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত চারটি আশ্রম কি কি?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের সমগ্রজীবনের জন্য চারটি আশ্রম রয়েছে। এইগুলি নিম্নরূপ :

১. ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন—ব্রহ্মচর্য জীবনের উদ্দেশ্য হল সৎ এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করা।
২. গার্হস্থ্য—গৃহস্থ বা পারিবারিক জীবন। গৃহস্থজীবনের উদ্দেশ্য হল দানশীল মনোবৃত্তি সহকারে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জীবন।
৩. বাণপ্রস্থ বা তপশ্চর্যার অনুশীলনের জন্য অবসর জীবন। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য হল পারমার্থিক জীবনের উন্নতির জন্য তপস্যা করা।
৪. সন্ন্যাস বা সত্য প্রচারের জন্য ত্যাগের জীবন। অর্থাৎ এই আশ্রমের উদ্দেশ্য হল জনগণের কাছে ভগবৎ তত্ত্ব প্রচার করা।

প্রশ্ন : ২১৪০ ॥ বাণপ্রস্থ আশ্রমের চারটি বিভাগ কি কি?

উত্তর : বাণপ্রস্থ আশ্রমের চারটি ভাগ হল নিম্নরূপ :

১. বৈখানস—যাঁরা সক্রিয় জীবন থেকে নিবৃত্ত হয়ে অর্ধসিদ্ধ খাদ্য আহার করে জীবনধারণ করেন।
২. বালখিল—যাঁরা নুতন অন্ন পেলে পূর্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন।
৩. ঔদুম্বর—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করার পর যেদিক সর্বপ্রথম দেখতে পান সেদিক থেকে আহরিত খাদ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী।
৪. ফেনপ—গাছ থেকে পতিত ফল দ্বারা জীবন ধারণকারী।

প্রশ্ন : ২১৪১ ॥ সন্ন্যাস আশ্রমের কয়টি বিভাগ রয়েছে এবং কি কি?

উত্তর : সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হল :

১. কুটীচক—আসক্তি রহিত পারিবারিক জীবন।
২. বহুদক—সবরকম জড়জাগতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্ময় সেবায় যুক্ত হওয়া।

৩. হংস—সম্পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞানের অনুশীলনে মগ্ন।
৪. নিষ্ক্রিয়—সব ধরনের কার্যকলাপের নিবৃত্তি।

প্রশ্ন : ২১৪২ ॥ বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী প্রথম মানব এবং মানবী কে কে ছিলেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। এই ব্রহ্মার দেহ থেকে প্রথম মানব এবং মানবী প্রকাশিত হয়। এই মানব স্বায়ম্ভুব মনু নামে পরিচিত হন। আর মানবী হলেন শতরূপা যিনি মনুর স্ত্রী হন। এদের মাধ্যমেই সাধারণ মনুষ্য সমাজের উদ্ভব এবং বিস্তৃতি হয়।

প্রশ্ন : ২১৪৩ ॥ ব্রহ্ম সম্প্রদায় এবং তার ধারাবাহিক ক্রম ও পরম্পরা কি? (ইসকনের ভাবধারা অনুযায়ী গুরুপরম্পরা কি?)

উত্তর : ব্রহ্মা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মার শিষ্য পরম্পরাকে বলা হয় ব্রহ্ম সম্প্রদায়। তার ধারবাহিক ক্রম হল : ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাসদেব-মধ্বমুনি (পূর্ণপ্রজ্ঞ)-পদ্মনাভ-নৃহরি-মাধব-অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-জ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধি-বিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম-পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্যতীর্থ-ব্যাসতীর্থ-লক্ষ্মীপতি-মাধবেন্দ্রপুরী-ঈশ্বরপুরী-শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-স্বরূপদামোদর-শ্রীরূপ গোস্বামী ও অন্যান্যরা, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণ দাস গোস্বামী, নরোত্তম দাস ঠাকুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ দাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ইসকন গুরুবর্গ।

প্রশ্ন : ২১৪৪ ॥ পরমেশ্বর ভগবানের বরাহ অবতার কিভাবে আবির্ভূত হন?

উত্তর : সৃষ্টির প্রথম দিকে মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মা তাঁর দেহ থেকে স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর স্ত্রী শতরূপাকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই পৃথিবী জলপ্লাবিত হয়ে সমুদ্রের গভীরে পতিত হয়। এই নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য ঐ সময় ভগবান ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র দিয়ে একটি বরাহ রূপে (শূকর রূপে) বহির্গত বা আবির্ভূত হন। সেই বরাহের আয়তন ছিল অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগ) পরিমাণ। পরে এই বরাহ বিশাল আকার ধারণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ২১৪৫ ॥ ভগবান বরাহদেব কোন্ কোন্ মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

উত্তর : স্বায়ম্ভুব এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে (১ মন্বন্তর = ৭১ চতুর্যুগ এবং চতুর্যুগ = ৪৩,২০,০০০ বছর) ভগবান শ্রী বরাহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের জলের মধ্য থেকে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি আদি (প্রথম) দৈত্য হিরন্যাক্ষকে সংহার করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিলেন (শ্বেতবরাহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন) এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি রক্তবর্ণ (রক্ত বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন) ধারণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ২১৪৬ ॥ জপ এবং কীর্তনের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

উত্তর : যখন নিঃশব্দে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করা হয় যাতে উচ্চারণকারীই তা শ্রবণ করতে পারে, তখন তাকে জপ বলা হয়। কিন্তু মন্ত্র যখন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা হয় যাতে সবাই তা শুনতে পায় তখন তাকে বলা হয় কীর্তন। বৈদিক মন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** নিঃশব্দে, উচ্চস্বরে অথবা উভয়ভাবে উচ্চারণ করা যায়। তাই তাকে বলা হয় মহামন্ত্র। তাই জপ এবং কীর্তন একই—শুধুমাত্র উচ্চারণ মাত্র ভিন্ন ।

প্রশ্ন : ২১৪৭ ॥ ভগবৎ ভক্তি বিকাশের কয়টি ভাব রয়েছে?

উত্তর : ভগবৎ ভক্তি বিকাশের তিনটি ভাব বা স্তর রয়েছে : স্থায়ীভাব, অনুভাব এবং মহাভাব। নিরবিচ্ছিন্ন পূর্ণ ভগবৎ প্রেমকে বলা হয় স্থায়ীভাব। যখন তা এক বিশেষ দিব্য সম্পর্কের দ্বারা সম্পন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় অনুভাব। কিন্তু মহাভাব ভগবানের স্বীর হ্লাদিনী শক্তির মধ্যেই দেখা যায়।

প্রশ্ন : ২১৪৮ ॥ বৈকুণ্ঠ (লোক) শব্দটির তাৎপর্য কি?

উত্তর : বৈকুণ্ঠ শব্দটির সাধারণ অর্থ হল কোনরকম উৎকণ্ঠা নেই—অর্থাৎ উৎকণ্ঠাবিহীন। চিদাকাশের গ্রহগুলিকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ। কারণ সেখানকার অধিবাসীরা সব ধরনের কুণ্ঠা থেকে মুক্ত। তাঁদের

জন্ম, মৃত্যু, জড়া, ভয় ও ব্যাধির কোন প্রশ্ন নেই। তাই তাঁদের কোন রকম উৎকণ্ঠাও নেই।

প্রশ্ন : ২১৪৯ ॥ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন বা জপের পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন কেন?

উত্তর : হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) নিরপরাধে জপ বা কীর্তন করতে হয়। নাম অপরাধ দশ প্রকার (যা পূর্বের কোন প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে)। এই দশ প্রকার নাম অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে বা থেকে মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়। এই প্রকারে মহামন্ত্র কীর্তন করলে দেহে স্বাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয় যাকে বলা হয় পুলকাশ্রু। পুলকের অর্থ হল আনন্দ-অনুভূতির লক্ষণ এবং অশ্রু হচ্ছে চোখের জল। কেউ যখন নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করেন (মহামন্ত্র জপ/কীর্তন) তখন তাঁর দেহে পুলক এবং অশ্রু অবশ্যই দেখা যায়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের সময় যদি এসব লক্ষণ না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে জপকারীর এখনও নাম অপরাধ রয়েছে। এর সংশোধনের (নাম অপরাধের) উপায় স্বরূপ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এক চমৎকার ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আদি লীলার অষ্টম অধ্যায়ের ৩১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে যদি কেউ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় অবলম্বন করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন তাহলে তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। এজন্যই মহামন্ত্র জপের বা কীর্তনের পূর্বে **"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ"**—এই মহিমার আশ্রয় আমরা নিয়ে থাকি।

প্রশ্ন : ২১৫০ ॥ জড় জগতের সর্বোচ্চ স্তর ব্রহ্মলোকের দূরত্ব সম্পর্কে কি কোন ধারণা দেয়া সম্ভব?

উত্তর : জড়জগতের কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে কেউ যদি আলোর গতিতে ভ্রমণ করে তবে এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছতে তার নাকি ৪০,০০০ বছর লাগবে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ড ১,৮৬,০০০ মাইল। ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট, ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন-রাত্রি, ৩৬৫ দিনে ১ বছর। এইভাবে হিসাব করলে

পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোকের দূরত্ব হবে : ১,৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ × ৪০,০০০ = ২৩৪৬২৭৮৪০০০০০০০ মাইল। এই দূরত্ব মানুষের কল্পনারও অতীত। তাই এক অর্থে ব্রহ্মলোকে পৌছা কোনদিন কোন জড় বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ সূর্যের দূরত্ব এর কাছে কিছুই নয় (সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৭,২১,০০০০০ মাইল)। উল্লেখ্য ভগবৎ ধাম চিদাকাশ ব্রহ্ম লোকের অনেক উর্ধ্বে। তাই তার দূরত্ব মাপার প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন : ২১৫১ ॥ পরমেশ্বর ভগবান অসীমেরও অসীম—সংখ্যা দ্বারা তার কি কোন আভাষ দেয়া যাবে?

উত্তর : এই ধরনের প্রশ্ন করাই মহাঅপরাধ। তবে কুতার্কিক এবং ভগবানে বিশ্বাস করে না—এরূপ মূঢ় এবং নরাধম ব্যক্তিদের জ্ঞাতার্থে তার আভাষ দেয়া যায় মাত্র। শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবান ১ নিমিষে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। অসীম সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য ব্রহ্মা আছেন। এই জড়জগতের ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল সৌর গণনা অনুযায়ী (অন্যত্র ব্যাখ্যা/বর্ণিত আছে) ৮৬৪,০০০০০০০ × ৩৬৫ × ১০০ = ৩১৫৩৬০০০০০০০০০ বছর। তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের ১ নিমিষ = ৩১৫৩৬০০০০০০০০০ × α (অসীম) = গণনার অতীত। তাই পরমেশ্বর ভগবান অসীমেরও অসীম বলা যায়। (১ নিমিষ = ৮/১৫ সেকেন্ড)।

প্রশ্ন : ২১৫২ ॥ ভগবৎ ভক্তের ক্রোধ থাকা উচিত নয়। এতদ্ সত্ত্বেও কোন্ অবস্থায় তারা ক্রোধ প্রকাশ করতে পারেন?

উত্তর : ভগবদ্ ভক্ত ক্রোধকে জয় করেন। তবে ভগবানের সেবায় বাধা প্রাপ্ত হলে তারা ক্রোধ প্রকাশ করলেও যুক্তিযুক্ত বলা যায়। যেমন চতুঃসন্ কুমার (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎ কুমার—ব্রহ্মার চার মানস পুত্র) বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীহরিকে দর্শন লাভের জন্য যখন দ্বারপাল কর্তৃক বাধাগ্রস্থ হয়েছিলেন তখন তাঁরা ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। এই রূপ ক্রোধ যুক্তিযুক্ত। কারণ ভগবৎ ভক্তকে শ্রীহরির দর্শনে বাধা দেয়ার কোন অধিকার কারোও নেই। তাছাড়া এরূপ ক্রোধতো জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য ছিল না।

প্রশ্ন : ২১৫৩ ॥ ভগবান এবং ভগবৎ ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ মুর্খদের গতি কিরূপ হয়?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার ১৬ অধ্যায়ের ১৯-২০ নং শ্লোক থেকে দেখা যায় যারা ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় তারা জঘন্য যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সব মুর্খ এবং নরাধমরা জন্ম-জন্মান্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারে না এবং তাই তারা নিরন্তর অধঃপতিত (ক্রমশঃ নিম্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ) হতে থাকে।

প্রশ্ন : ২১৫৪ ॥ পরমেশ্বর ভগবানকে মদন-মোহন বলা হয় কেন?

উত্তর : মদন বা কামদেব হলেন দেবতাদের মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। পরমেশ্বর ভগবানের সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে তা শত-সহস্র কামদেবের রূপকে পরাভূত করে। অর্থাৎ তাঁর সৌন্দর্য মদনকেও মোহিত করে দেয়। তাই তাঁকে বলা হয় মদন-মোহন।

প্রশ্ন : ২১৫৫ ॥ ভগবদ্ ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধারানীর সৌন্দর্য কিভাবে দর্শন করতে চান?

উত্তর : ভগবৎ ভক্তের মধ্যে কেউ বৈকুণ্ঠধামে এবং কেউবা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সৌন্দর্য উৎকৃষ্ট এবং তা বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। (শ্রীমদ্ ভাগবত ৩/১৫/৪২)। কারণ বৈকুণ্ঠলোকে ভগবদ্ ভক্তরা ভগবানকে সবচাইতে সুন্দররূপে দর্শন করতে চান। কিন্তু গোলোক বৃন্দাবনে বা কৃষ্ণলোকের ভক্তরা শ্রীমতি রাধারানীকে শ্রীকৃষ্ণের থেকেও অধিক সুন্দররূপে দর্শন করতে চান।

প্রশ্ন : ২১৫৬ ॥ কৃষ্ণ ভাবনামৃত কি?

উত্তর : জীবাত্মা তার চেতনার মাধ্যমে মানুষের সমগ্র শরীরে বিরাজমান। পরমাত্মা তাঁর পরম চেতনার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে বিদ্যমান। সীমিত চেতনা সম্পন্ন কোন এক শরীরের জীবাত্মা অন্য কোন শরীরে বিদ্যমান থাকতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মা সর্বত্র এবং

সকলের অন্তরে উপস্থিত থাকায় প্রত্যেকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। অর্থাৎ স্বতন্ত্র জীবাত্মার চেতনা পরম চেতনারূপে কাজ করতে পারে না। এই পরম চেতনা কিন্তু লাভ করা সম্ভব পরমেশ্বর ভগবানের (শ্রীকৃষ্ণ) চেতনার সঙ্গে স্বতন্ত্র জীবের চেতনাকে সংযোগের মাধ্যমে। এই সংযোগ করার পন্থাকেই বলা হয় কৃষ্ণে শরণাগতি বা কৃষ্ণভাবনামৃত।

প্রশ্ন : ২১৫৭ ॥ যিনি বৈষ্ণব তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণ-এর অর্থ কি?

উত্তর : যাঁরা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ তারা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম অবলোকন করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের বিষ্ণুরূপেরই আরাধনা করেন। আবার বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন। তাই যিনি পরমেশ্বরকে জানেন—অর্থাৎ বৈষ্ণব তিনি অবশ্যই গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ।

প্রশ্ন : ২১৫৮ ॥ বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয় কেবলমাত্র ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসন কুমারদের অভিশাপের ফলেই কি বৈকুণ্ঠ থেকে জড়জগতে পতিত হয়েছিলেন?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী চতুঃসনকুমার জয়-বিজয়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এজন্য যে তাঁরা তাঁদেরকে বৈকুণ্ঠের অধিপতি শ্রীনারায়ণের সাথে দেখা করতে বাধা দেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তাই তাঁরা জড়জগতে জয় বিজয়ের পতন কামনা করেন (৩/১৫/৩৪)। তবে বৈকুণ্ঠ থেকে এঁদের প্রস্থান লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা যে পূর্ব নির্ধারিত ছিল তা আমরা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে জানতে পারি। জয়-বিজয়কে ভগবান স্মরণ করিয়ে দেন যে পূর্বে একসময় লক্ষ্মীদেবী যখন বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে পুণরায় তাঁর কাছে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি বিশ্রাম করছেন বলে তারা তাঁকে দ্বারে বাধা দেওয়ায় লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এর ফলে জড়জগতে তাদের অধঃপতন পূর্ব নির্ধারিত ছিল (ভাগবত ৩/১৬/৩০)।

প্রশ্ন : ২১৫৯ ॥ নন্দোৎসব কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরদিন নন্দ মহারাজের আলয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে যে আনন্দোৎসব হয়

তাকে নন্দোৎসব বলা হয়। সেদিন নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদেরকে নানারত্নে ভূষিত অসংখ্য গাভী ও বহুদামী উপহার প্রদান করেন। সমস্ত গোপ-গোপীরা সেদিন মহানন্দে ঐ উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

প্রশ্ন : ২১৬০ ॥ মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন মহাপাত্র কে কে ছিলেন?

উত্তর : মহাপ্রভু অপ্রকটের পূর্বে শেষ ১২ বছর গম্ভীরা লীলা করেন। এই ১২ বছর তিনি আবিষ্ট—অর্থাৎ প্রায়শঃ অচেতন অবস্থায় থাকতেন। এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র (রাতদিন) রোদন করে, ঘন ঘন মুর্চ্ছা যেয়ে, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে গম্ভীরা লীলা প্রদর্শন করেন। এই লীলা এত নিগুঢ় যে বাইরের কেউ তা জানতে পারে নাই। কেবলমাত্র সাড়ে তিনজন পাত্র এই লীলার সহায়তা করেছিলেন। তারা হলেন :

১. স্বরূপ দামোদর, ২. রামানন্দ রায় (রামরায়), ৩. শিখি মাহিতী এবং আর (অর্দ্ধজন) মাধবী দাসী। মাধবী দাসী শিখি মাহিতীর বোন। তারা সাড়ে তিনজন মহাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত। কেননা মাধবী দাসী স্ত্রীলোক বলে অর্দ্ধজন ধরা হয়।

প্রশ্ন : ২১৬১ ॥ মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলা কি?

উত্তর : গম্ভীরা-লীলা শ্রীমতি রাধারানী এবং শ্রীকৃষ্ণের সাথে যে সম্পর্ক তা নিয়ে। শ্রীমতি রাধা কে? না, তিনি মাধুর্য্যময় ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রধানা প্রেয়সী। এর অর্থ শ্রীমতি রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর কেউ নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতি রাধার কি ভাব তা যে লীলার মাধ্যমে মহাপ্রভু বর্ণনা এবং প্রকাশ করেন তাকেই গম্ভীরা লীলা বলা হয়। শ্রীমতি রাধার প্রতি শ্রীভগবানের মনের ভাব কি তা জীবের পক্ষে অতি অল্প জানা সম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবানের যিনি প্রেয়সী, ভগবান যাঁর প্রাণ তাঁর মনের ভাব জীব সাধন-ভজন করলে প্রায় সবই জানতে পারে।

লেখক পরিচিতি

শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন নিজ গ্রামের রাজদিয়া অভয় উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন। বি. এ (পাস), বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেছেন ২৫টি।

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পণ এবং ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হয়েকৃষ্ণ সমাচার" এবং ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকায় এ পর্যন্ত তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ।